ফলিত পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

ফলিত পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

রচনায়ঃ

১. ড. মোহাম্মদ রাজু আহমেদ
উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক, বারটান

২. মোঃ কাওসার আহমেদ
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারটান

সম্পাদনায়ঃ

১. জনাব ঝরনা বেগম
নির্বাহী পরিচালক, বারটান

২. জনাব কাজী আবুল কালাম
পরিচালক, বারটান

সহযোগিতায়ঃ

বারটান এর সকল কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

সেশন-১ঃ ফলিত পুষ্টি বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য

- খাদ্য, পুষ্টি ও ফলিত পুষ্টি সম্পর্কে জানা
- পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ যে স্বাস্থ্যের জন্য কতটা জরুরী তা উপলব্ধি করা
- সুষম খাদ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়া
- ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য যে শরীরে ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে থাকে সে সম্পর্কে জানা

উপকরণ

- তিন সেট ফুড কার্ড
- স্থানীয় রান্নার পাত্র
- স্থানীয় চুলা

- প্রথমেই প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ৫টি গ্রুপে ভাগ করে নিতে হবে।
- চুলাটি দেখান ও সে সম্পর্কে প্রশ্ন করুন; রান্না করার জন্য চুলায় আগুন জ্বালাতে কি কি?

অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে কিছু মতামত নেয়ার পর এই বক্তব্যটি তুলে ধরুনঃ

আপনারা বলেছেন যে, চুলা জ্বালাতে খড়ি, ম্যাচ/ দিয়াশলাই, তেল ও বাতাস লাগে। যতক্ষণ পর্যন্ত শুকনা খড়ি/ লাকড়ি পাওয়া যায়, চুলা ভালোভাবে জ্বলে। আবার লাকড়ি/ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কমে গেলে আগুনের তেজ কমতে থাকে। আমাদের শরীরটাও ঠিক চুলার মত; এই শরীরকে সুস্থ সবল রাখতে হলে ভালো জ্বালানী অর্থাৎ পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। তা না হলে আমরা ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ব। মানুষের শরীরে জ্বালানী হলো বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যা আমরা খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করে

এরপর খাদ্য, পুষ্টি, ফলিত পুষ্টি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করুন

খাদ্য

খাদ্য হচ্ছে এমন কতগুলো প্রয়োজনীয় উপাদানের সমষ্টি যা গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বজায় থাকে, ক্ষয়পূরণ ও বিভিন্নভাবে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয় এবং সর্বোপরি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে।

পুষ্টি

পুষ্টি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রহণ করা খাদ্য শোষিত হয়ে শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে, শরীরের বৃদ্ধি সাধন করে এবং শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে।

ফলিত পুষ্টি

ফলিত পুষ্টি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

১। সঠিক উপায়ে খাদ্য নির্বাচন;
২। নির্বাচিত খাদ্য সঠিক উপায়ে রান্নার জন্য প্রস্তুতকরণ;
৩। সঠিক উপায়ে রান্না করা; এবং
৪। সঠিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য গ্রহণ।

চিত্রঃ ফলিত পুষ্টি

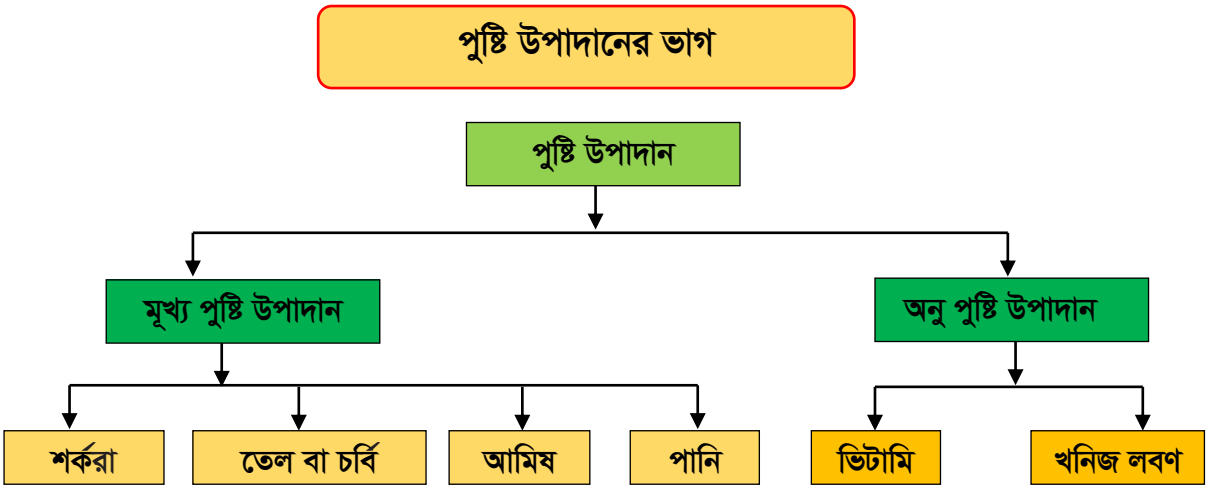

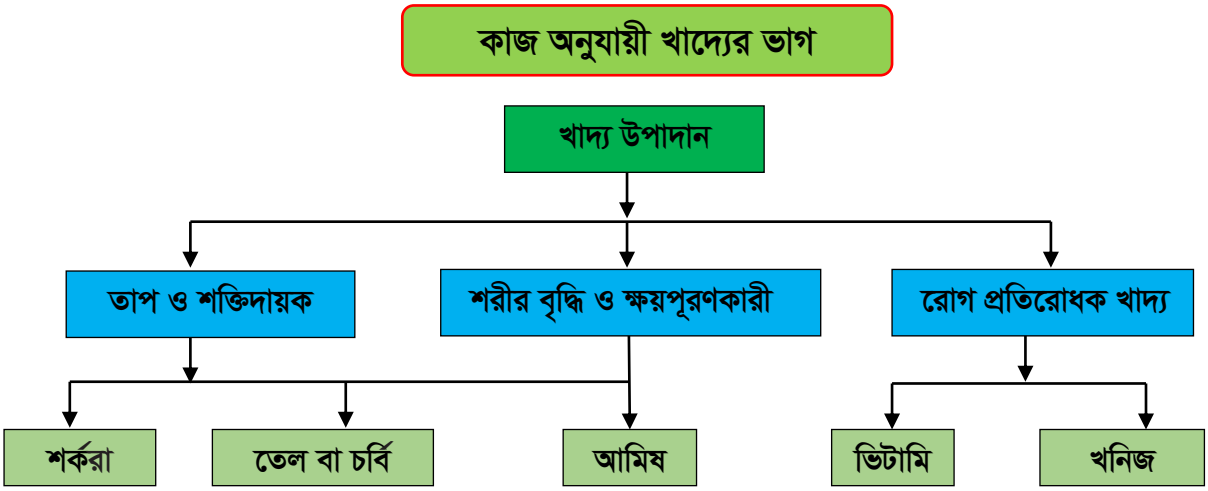

খাদ্যগোষ্ঠী (Food Groups)

নূন্যতম খাদ্য-তালিকাগত বৈচিত্র্য (Minimum Dietary Diversity) বিবেচনায় নিয়ে খাদ্য গোষ্টিকে নিম্নবর্ণিত ১০ ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১) শস্য, কন্দ ও শিকড় এবং উদ্ভিদ জাতীয় (Grains, White roots, Tubers, and Plantains);
২) বিভিন্ন ধরণের ডাল, শিম, ও মটরশুঁটি (Pulses: Beans, Peas and Lentils);
৩) বিভিন্ন ধরণের বাদাম ও বিচি (Nuts and Seeds);
৪) বিভিন্ন ধরণের মাংস ও মাছ (Meat, Poultry, and Fish);
৫) দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্য (Dairy);
৬) ডিম (Egg);
৭) গাঢ় সবুজ শাকসবজি (Dark green leafy vegetables);
৮) ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ফল ও সবজি (Vitamin-A rich fruits and vegetables);
৯) অন্যান্য শাকসবজি (Others Vegetables); এবং
১০) অন্যান্য ফলমূল (Others Fruits) ।

উক্ত ১০ ধরণের খাদ্য তালিকা থেকে ন্যূনতম ৪ ধরণের খাদ্য প্রতিদিনের খাবার তালিকাতে রাখতে হবে। যেখানে কমপক্ষে একটি প্রাণিজ উৎস থেকে বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

সুষম খাদ্য

যে খাদ্যে প্রতিদিনের শারিরীক চাহিদা অনুযায়ী সকল প্রকার পুষ্টি উপাদান সঠিক পরিমাণে থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে।

পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের উপকারিতা

অপুষ্টির ভূমিকা

অনুশীলনঃ স্থানীয় খাদ্য দিয়ে "Food Groping" খেলার মাধ্যমে সুষম খাবার নিশ্চিতকরণ।

- সঞ্চালক সংগৃহীত স্থানীয় খাদ্যসমূহকে একটি পরিস্কার মাদুরে বিছিয়ে রাখতে বলবেন এবং যে সব খাবার বা ফল সাধারণত গ্রামে পাওয়া যায় কিন্তু এক্ষেত্রে পাওয়া যায় নি (ধরা যা মৌসুমি ফল বা সবজি) সেগুলির নাম জিজ্ঞেস করবেন। উত্তরগুলি ফুড কার্ড থেকে বেঁছে নিয়ে সঞ্চালক খাবারের কাছে রাখবেন।
- খাদ্য-গোষ্ঠির চার্টটির সাহায্যে সঞ্চালক আলোচনা করবেন এবং প্রতিটি আঞ্চলিক খাদ্য-গোষ্ঠির থেকে যথেষ্ট পরিমাণ খাওয়ার খাবার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বলবেন। মূল খাদ্যগুলি মাঝখানে রাখা হবে এবং তার চার পাশে রাখা হবে সাহায্যকারী খাদ্য-শক্তিদায়ক, বৃদ্ধিসহায়ক ও ক্ষয়পূরণকারি এবং রোগ প্রতিরোধক খাদ্যগুলিকে।
- সঞ্চালক সবাইকে সকল খাদ্য গ্রুপের উদাহরণ নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করবেন এবং কোন খাদ্য শ্রেণিতে অন্তভূক্ত তা চিনতে সাহায্য করবে। সঞ্চালক এই সময়ে এটাও আলোচনা করবেন যে খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের শরীর নানা পুষ্টি পায় এবং এইগুলির সাহায্যেই আমাদের শরীর বাড়তে এবং কাজ করতে পারে। খাদ্যই আমাদের শক্তি দেয় চলাফেরা করতে, ভাবতে এবং কাজ করতে ইত্যাদি আমাদের শক্তি-সমর্থ রাখতে, রোগ প্রতরোধ করতে এবং সংক্রমণের হাত থেকে আমাদের বাঁচাতেও যা উপকরণের দরকার, তা আমরা খাদ্যের মাধ্যমেই পেয়ে থাকি।

সদস্যদের খাদ্য গোষ্ঠী সম্পর্কে বোঝাতে সঞ্চালক একটি চার্ট ব্যবহার করবেন, যাতে খাদ্য গোষ্ঠীগুলি, তাদের কাজ এবং গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কি কি পড়ে তার বিবরণ দেওয়া থাকবে। এফ এ ও তিনটি গোষ্ঠির কথা বলে:

তাপ ও শক্তিদায়ক খাদ্যঃ শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাবার যেমন- ভাত, রুটি, আলু, গুড়, চিনি, মিষ্টিআলু, পাউরুটি, তেল, মাখন, ঘি, চর্বি, মধু, গুড়, বিস্কুট, বাদাম, নারকেল ইত্যাদি।

শরীর বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণকারী খাদ্যঃ আমিষ জাতীয় খাবার যেমন- মাছ, মাংস, সয়াবিন ও অন্যান্য ডাল, দুধ, ডিম,সিমের বীচি, ছোটমাছ, বড়মাছ, কলিজা ইত্যাদি।

রোগ প্রতিরোধক খাদ্যঃ ভিটামিন ও খণিজ সমৃদ্ধ খাবার যেমন- গাঢ় হলুদ ও সবুজ রঙের সব ধরণের শাক ও ফলমূল, পাকা আম, পাকা তাল, পাকা পেঁপে, পাকা কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, আমলকি, আমড়া, কলা, লেবু, গাজর, মিষ্টিকুমড়া, শিম, ছোটমাছ, দুধ, ডিম, কলিজা ইত্যাদি।

মূল খাদ্য আমাদের শরীরের বেশির ভাগ প্রয়োজন মেটায়, কিন্তু তার সংগে আমাদেও দরকার ;

চলার খাবারঃ শক্তিদায়ক খাদ্য গোষ্ঠী, যা আমাদের কাজ করতে, দৌড়াতে ও খেলতে সাহায্য করে।

বাড়ার খাবারঃ পেশী সহায়ক খাদ্যগোষ্ঠী, যা আমাদের পেশী ও স্নায়ুকে বাড়াতে সাহায্য করে।

উজ্জলতার খাবারঃ সুরক্ষাকারী খাদ্যগোষ্ঠী, যা আমাদের চুল, চোখ ও ত্বককে উজ্জল রাখে।

সঞ্চালক বোর্ডে তিনটি বর্গক্ষেত্র আঁকবেন এবং নিচের ছবি তিনটি এই বোর্ডের মাঝখানে টেপ দিয়ে আটকিয়ে দিবেন। এর পর-

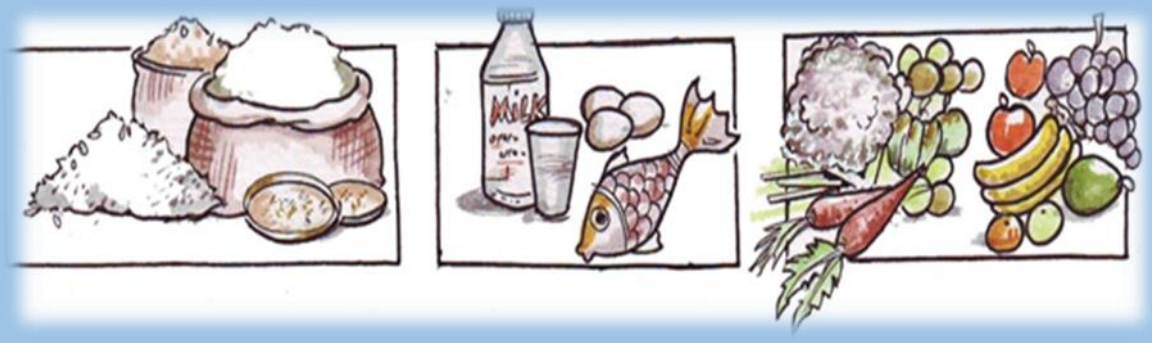

তিন জন অংশগ্রহণকারীকে অনুরোধ করবেন একটি একটি করে তাঁদের আনা খাবারগুলি সঠিক শ্রেণীতে রাখতে।

অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা বলবেন যে সঠিক জায়গায় খাবারটি রাখা হয়েছে কি না। সব খাবারগুলি একইভাবে রাখতে হবে।

যা যা আনা হয় নি বা অন্য মৌসুমে পাওয়া যায়, সেগুলিরো নাম কাগজের টুকরোতে লিখে সঠিক শ্রেনিতে রাখতে হবে।.

এই কাজগুলি সম্পন্ন হয়ে গেলে সঞ্চালক সব সদস্যকে অনুরোধ করবেন যেন তাঁরা এই সব খাদ্য-গোষ্ঠির খাবার নিজেদের খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন, গর্ভবতী এবং স্তন্যদায়িনী মহিলারা যাতে নিজদের খাদ্য এই ভাবে সমৃদ্ধ করেন এবং শিশুদের খাদ্যতালিকায় যাতে এই খাদ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সঞ্চালক বিশেষ জোর দেবেন খাদ্যে সামান্য তেল যোগ করে ৬-৫৯ মাসের শিশুদের পরিপূরক খাদ্যের শক্তির পরিমাণ বাড়ানোর ব্যাপারে। তিনি এটাও জানাবেন যে খাদ্যে বৈচিত্র খুব প্রয়োজন, বিশেষ করে আয়রন, ক্যালসিয়াম ও ফলিক অ্যাসিড যুক্ত খাবার। পরিবারের খাদ্যে বিভিন্ন রঙিন ফলমূল, যেমন লাল ও কমলা ফলমূল ও শাক- সবজি, সবুজ শাকপাতা, ডিম, ডাল, বাদাম প্রচুর পরিমানে থাকা দরকার।সম্ভব হলে বাচ্চাদের মাংস জাতীয় খাবার (মাংস, মাছ, কলিজা) বা দুধ দেওয়া দরকার, কারণ তাতে বাচ্চাদের বৃদ্ধি ভালো হয়।

আলোচনার সময়ে সঞ্চালক চেষ্টা করবেন গর্ভাবস্থায় বা দুদ্ধদানকারী মহিলাদের ক্ষেত্রে বা শিশুদের পরিপূরক খাদ্য শুরু করার ক্ষেত্রে যে খাদ্য সম্মন্ধীয় নানা সংস্কার ও বিধিনিষেধ থাকে, সেগুলির সঠিক সমালোচনা করতে।

সঞ্চালক জোর দিয়ে বলবেন যে সব খাদ্য-গোষ্ঠির খাবারই গ্রামে পাওয়া যায় এবং সুষম খাদ্যের জন্য এগুলি স্থানীয় ভাবে উৎপন্ন করা যায় বা সারা বছর ধরে সংগ্রহ করা যায়। প্রয়োজনে কিছু খাদ্য বাজার থেকে কেনা যেতে পারে।

মূখ্য পুষ্টি উপাদান			
পুষ্টি উপাদান	**কাজ**	**খাদ্য উৎস**	**অপুষ্টিজনিত সমস্যা**
শর্করা 	• শক্তির প্রধান উৎস • আঁশের অন্যতম উৎস • ১ গ্রাম শর্করা হতে ৪ কিঃ ক্যাঃ শক্তি পাওয়া যায়	ধান, গম, ভুট্টা, যব, কাঁচা কলা, আলু, মিষ্টি আলু, গুড়, চিনি ইত্যাদি।	• শারীরিক ক্ষয় • শারীরিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় • শারীরিক বৃদ্ধি ও উন্নয়ন হ্রাস পায় • অতিরিক্ত গ্রহণ করলে ফ্যাট/চর্বি হিসাবে শরীরে জমা হয়
আমিষ 	• শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে।	**প্রাণিজ উৎস ঃ** মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য।**উদ্ভিজ্জ উৎস ঃ** ডাল, সীম, মটরশুটি, বরবটি, বাদাম এবং যে কোন বীজ (যেমন- কাঁঠালের বীজ)	• খাটো হওয়া • ওজনহীনতা • কোয়াসিওরকোর (kwashiorkor)
চর্বি/তেল 	• ভিটামিন এ, ডি, ই, কে দেহে পরিশোষণের জন্য আবশ্যক • শক্তির উৎস • ১ গ্রাম তেল হতে ৯ কিঃ ক্যাঃ শক্তি পাওয়া যায় • শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ যেমন-হৃৎপিন্ড, বৃক্ক ও খাদ্যনালীকে প্রতিরোধমূলক সহায়তা প্রদান করে। • খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি করে।	**প্রাণিজ উৎস ঃ** ঘি, বাটার, পনির, দুধ, মাছের তেল, চর্বিযুক্ত মাংস, মুরগী, মাছ। **উদ্ভিজ্জ উৎস ঃ** বাদাম তেল, সরিষার তেল, সয়াবিন তেল, নারিকেল তেল, সূর্যমুখী	• ভিটামিন এ, ডি, ই, কে দেহ কর্তৃক পরিশোষণ করতে পারে না। • হৃদরোগ • স্থূলতা
আঁশ 	• শরীরে কোলেস্টেরল কমাতে সহায়তা করে • শরীরে ওজন হ্রাস করতে সাহায্য করে • হজমে ও পেট পরিষ্কার করতে সহায়তা করে।	আস্ত দানাদার খাদ্য, সীম জাতীয় সবজি, মূল ও কান্ড জাতীয় ফসল যেমন- মিষ্টি আলু, আলু, মূলা প্রভৃতি।	• কোষ্ঠ কাঠিন্য • রক্তে উচ্চ মাত্রায় কোলেস্টেরল • ক্যান্সার • হৃদরোগ

অনু পুষ্টি উপাদান (ভিটামিন)			
চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন			
ভিটামিন-এ 	• দৃষ্টি শক্তি বাড়ায় • শরীরের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন করে • রোগ প্রতিরোধ করে • সুষ্ঠুভাবে হাড় গঠনে সহায়তা করে	গাঢ় সবুজ পাতা জাতীয় সবজি, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, কমলা শাঁসযুক্ত মিষ্টি আলু, পেঁপে, পাকা তাল, ডেউয়া, ছোট মাছ, কলিজা, ডিম, মাছের তেল, দুধ, ইত্যাদি।	• রাতকানা • খর্বাকৃতি • রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।
ভিটামিন-ডি 	• দেহের অন্ত্রে (intestine) Ca শোষণে সহায়তা করে। • হাড়ে Ca সংরক্ষণে সহায়তা করে।	মাছের কলিজা, মাছ, দুধ, মাখন, ডিমের কুসুম, লেটুস ইত্যাদি।	• পেশী ভঙ্গুরতা (muscular tenderness) • খর্বাকৃতি • রোগ প্রতিরোধে ক্ষমতা হ্রাস পায়।
ভিটামিন-ই 	• কোষের গঠন অটুট রাখে • অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে • জনন কোষ তৈরিতে অংশগ্রহণ করে • রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।	পাতাজাতীয় সবজি, বাদাম, ডিমের কুসুম, কলিজা, দুধের চর্বি, আস্ত দানাদার জাতীয় খাদ্য, সূর্যমুখী তেল, নারকেল, টমেটো, মিষ্টি আলু ইত্যাদি।	• শিশুদের রক্তস্বল্পতা • নার্ভ ও পেশীর অস্বাভাবিকতা • চুলকানী • বডি ফ্লুইড বা শরীরে তরল পদার্থ জমা হয়।
ভিটামিন-কে 	• রক্ত জমাট বাঁধাতে সহায়তা করে • হেমোরাইজ হতে বাধা প্রদান করে	ব্রোকলী, দুধ, বাধাকপি, লেটুস, পালংশাক, মটর, পনির ইত্যাদি।	হেমোরেজ • বয়স্ক লোকের মাথার হাড় ক্ষয় হয়

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন			
পুষ্টি উপাদান	**কাজ**	**খাদ্য উৎস**	**অপুষ্টিজনিত সমস্যা**
ভিটামিন-বি$_১$ (থায়ামিন)	• স্বাদ বৃদ্ধি করে • শক্তি বিপাকে সহায়তা করে • স্নায়ুতন্ত্রের সঠিকভাবে কাজের জন্য আবশ্যক	আস্ত দানাদার খাদ্য, সীম, মাংস, মাছ, মুরগী, ডিম, দুধ, তৈলবীজ ইত্যাদি।	• বেরিবেরি • পেশীর দূর্বলতা • ক্ষুধাহীনতা • দেহকোষে জমা হওয়া, হৃদপিন্ড আকারে বড় করে
ভিটামিন- বি$_২$ (রিবোফ্লাবিন)	• শক্তি বিপাকে সহায়তা করে • স্বাভাবিক দৃষ্টি, স্বাস্থ্য ও সুন্দর ত্বক গঠনে সহায়তা করে।	দুধ, ডিম, কলিজা, দই, মাংস, গাঢ় সবুজ পাতা, আস্ত দানাদার মাছ, সীম ইত্যাদি।	• জিহ্বার প্রদাহ • পেট ফোলা • দেহ রস জমা হয়
ভিটামিন- বি$_৩$ (নায়াসিন)	• শক্তি বিপাকে সহায়তা করে • স্বাভাবিক দৃষ্টি, স্বাস্থ্য ও সুন্দর ত্বক গঠনে সহায়তা করে।	দুধ, ডিম, বাদাম, আস্ত দানাদার খাদ্য, মাছ, মাশরুম, মটরদানা ইত্যাদি।	• চর্মরোগ • ডায়রিয়া • স্মৃতিভ্রংশ
ভিটামিন- বি$_৬$ (পাইরিডক্সিন)	• চর্বি ও আমিষের বিপাক ক্রিয়া ও পরিশোষণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে	মিষ্টি আলু, বাঁধা কপি, ব্রকোলি, মাংস, সবুজ পাতা সবজি, মাছ, তরমুজ তৈলবীজ, ভুট্টা	• জিহ্বার প্রদাহ জনিত রোগ • ঠোটের ক্ষত এবং মুখের কিনারায় ঘা জনিত রোগ
ফোলেট (ফলিকএসিড)	• নতুন কোষ গঠনে বিশেষ করে লৌহিত রক্ত কণিকা গঠনে • এছাড়া গ্যাস্ট্রো-ইনটেস্টাইনাল কোষ গঠনেও সহায়তা করে।	কলিজা, লাল মাংস, সবুজ পাতা সবজি, মাছ, সীম জাতীয় সবজি, বাদাম, আস্ত দানাদার খাদ্য, ডিমের কুসুম	• অ্যানিমিয়া • নবোজাত শিশুর স্নায়ুসংক্রান্ত ত্রুটি (Neural tube defects)

অনু পুষ্টি উপাদান (খনিজ)			
পুষ্টি উপাদান	**কাজ**	**খাদ্য উৎস**	**অপুষ্টিজনিত সমস্যা**
ক্যালসিয়াম 	• হাড় ও দাঁত গঠনে সহায়তা করে • হৃৎপিন্ড ও পেশীর কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে • রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে • রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম গঠনে সহায়তা করে।	দুধ, গাড় সবুজ পাতা জাতীয় সবজি, শুটকী মাছ, চিংড়ী, সীম জাতীয় বীজ, মসুর ও মটর ডাল, ঢেঁড়শ, যব, তৈল জাতীয় বীজ।	• অস্টিও পোরেসিস ঃ পূর্ণ বয়স্কদের হাড় ক্ষয় বা ভঙ্গুর • অস্টিও মেলাসিয়া ঃ দুর্বল হাড় গঠন • উচ্চ রক্তচাপ
আয়রণ 	• রক্তে আক্সিজেন পৌঁছানের কাজ করে • পুরাতন লোহিত রক্ত কণিকা অপসারণ ও নতুন রক্ত কণিকা তৈরি করে।	লাল মাংস, সয়াবিন, কলিজা, শুকনা ফল, মুরগী, ডিম, বাদাম, পাতা জাতীয় সবজি, মসুর, মটর, সীম	• রক্তস্বল্পতা • নিম্নমাত্রায় আয়রন জমা • অতিমাত্রায় শারীরিক ক্লান্তি
পটাশিয়াম 	• হৃদপিন্ডের পেশীকে সচল রাখা • রক্তচাপ হ্রাস করতে এবং স্ট্রোক হতে বাধা প্রদান করে।	কলা, আনারস, কমলা, আপেল, অ্যাভাকাডো, আলু, মেটে আলু, সবুজ মটর, দধি, বাদাম, ডাব	• পেশী সংকোচন • দুর্বলতা
আয়োডিন 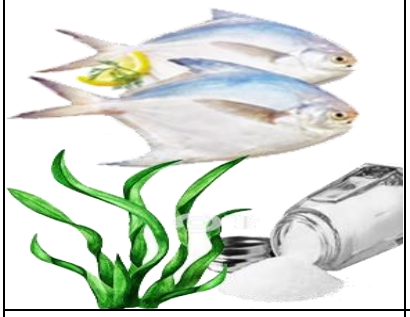	• মস্তিস্ক ও স্নায়ুতন্ত্র এর সঠিক গঠন ও সচল রাখা নিশ্চিত করে। • শরীরের বৃদ্ধি ও বিপাক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। • খাদ্য হতে শক্তি উৎপন্ন হতে সহায়তা করে।	সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য সীফুড, প্রাণিজ দ্রব্যাদি, আয়োডিন সমৃদ্ধ মাটি থেকে উৎপাদিত ফসল, আয়োডিন সমৃদ্ধ লবণ।	• গলগন্ড (Goiter) • মানসিক প্রতিবন্ধী
ফ্লোরিন (Fluorine) 	• দাঁত ক্ষয় রোধ করে।	সামুদ্রিক খাদ্য, চা, পানি	• দাঁত ক্ষয়
জিংক 	• শর্করা, প্রোটিন ও চর্বির বিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে। • কোষ বিভাজনে সহায়তা করে। • রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। • গন্ধ ও স্বাদ নির্ধারণে সহায়তা করে। • ক্ষত সারাতে সাহায্য করে। • ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।	সবজি, ভূট্টা, পেয়ারা, কুমড়া বীজ, সজিনা, ডিম, মাংস (স্তন্যপায়ী ও পাখি), দুধ, দুধ জাতীয় খাদ্য, বাদাম, বীজ, সীম জাতীয় খাদ্য	• খর্বাকৃতি হওয়া • ত্বকে দাগ সৃষ্টি • রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া। • স্মৃতি শক্তি হ্রাস

মাশরাফি-বিন-খালিদ ৩০ বছর বয়সী একজন চাকুরীজীবী। তার দৈহিক ওজন ৭০ কেজি এবং উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি। তিনি সপ্তাহে ৩-৫ দিন পরিমিত ব্যায়াম করেন। বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক নির্মিত পুষ্টি বিষয় মোবাইল অ্যাপস **"আমার পুষ্টি"** অনুযায়ী তার বি.এম.আই ২২.৭৯ যা স্বাভাবিক এবং তাকে প্রতিদিন ২৬৩৫ কিলোক্যালরি (প্রায়) খাদ্য গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। চলুন তার জন্য একদিনের খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করিঃ

সকালের খাবার				
ক্রমিক নং	**খাবারের নাম**	**সংখ্যা**	**সার্ভিং সাইজ**	**কিলোক্যালরি**
০১.	রুটি	২ টি (আটা ৭০ গ্রাম)		২০০
০২.	মিশ্র সবজি	১ বাটি (২০০ গ্রাম)		১০০
০৩.	ডিম	১ টি (৬০ গ্রাম)		৭০
০৪.	কলা	১ টি (৫০ গ্রাম)		৫০
০৫.	রঙ চা (চিনি সহ)	১ কাপ		২৯
সকালের নাস্তা				
০৬.	খেজুর	৭ টি (৫০ গ্রাম)		১৫০
০৭.	চীনাবাদাম	৫০ গ্রাম		২৯৩

দুপুরের খাবার				
০৯.	ভাত	১ কাপ (২০০ গ্রাম)		২০০
১০.	মাংস (মুরগী)	২ পিছ (১০০ গ্রাম)		১২৮
১১.	শাক (পাতা জাতীয়)	১ বাটি (২০০ গ্রাম)		১০০
১২.	মিশ্র সবজি	১ বাটি (২০০ গ্রাম)		১০০
১৩.	ডাল (ঘন)	১ বাটি (২০০ মিঃলিঃ)		১৮০
বিকালের নাস্তা				
১৪.	মুড়ি	১ বাটি (৫০ গ্রাম)		১৮০
১৫.	ছোলা	১ বাটি (৫০ গ্রাম)		১৮০
১৬.	মৌসুমী ফল (পেয়ারা)	১/২ বাটি (১০০ গ্রাম)		৬৩
১৭.	কলা	১ টি (৫০ গ্রাম)		৫০

১৮.	রঙ চা (চিনি সহ)	১ কাপ		২৯
রাতের খাবার				
১৮.	ভাত	২ কাপ		২০০
১৯.	মাছ	১ পিছ (৮০ গ্রাম)		১০০
২০.	মিশ্র সবজি	১ বাটি (২০০ গ্রাম)		১০০
২১.	দুধ	১ কাপ (১৫০ মিঃলিঃ)		১০০
২২.	মৌসুমী ফল (পেঁপে)	১/২ বাটি (১০০ গ্রাম)		৩৩
			সর্বমোট	**২৬৩৫ কিঃ ক্যালরি**

সূত্রঃ

1. *Dietary Guidelines for Bangladesh.*
2. *Food Composition Table for Bangladesh.*
3. *www.lentil.org/health-nutrition/nutritional-information/*

পদটিকাঃ

১. ৬০ গ্রাম ওজনের একটি ফার্মের মুরগীর ডিমে ৭০ কিলোক্যালরি বিদ্যমান। তবে তেল দিয়ে ডিম ভাজলে কিলোক্যালরির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

২. চিনিসহ দুধ চা এবং চিনিসহ কফি হতে যথাক্রমে ৪১ ও ৩৮ কিলোক্যালরি পাওয়া যায়। তবে চিনি ছাড়া রঙ চা, দুধ চা ও কফি হতে তুলনামূলকভাবে কম কিলোক্যালরি পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, শরীরে অনুপুষ্টি উপাদানসমূহ যথাযথভাবে পরিশোষণের জন্য যেকোন খাবার খাওয়ার ৩০ মিনিট পর চা পান উত্তম।

৩. মৌসুমী ফল হিসাবে পেঁয়ারা ও পেঁপে ব্যবহার করা হয়েছে। মৌসুমী ফল হিসাবে পেঁয়ারা ও পেঁপের পরিবর্তে যহজলভ্য যেকোন মৌসুমী ফল খাওয়া যেতে পারে।

৪. রাতের খাবারে ১ বাটি ভাতের পরিবর্তে ৭০ গ্রাম আটা হতে প্রাপ্ত ২ টি রুটি খাওয়া যেতে পারে।

৫. দুধ খেলে যাদের হজমে সমস্যা হয় তারা দুধের পরিবর্তে দই বা দুগ্ধজাতীয় অন্যান্য খাবার খেতে পারে।

সেশন-২ঃ পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

- মানব শরীরে পুষ্টি ও অপুষ্টির প্রভাব সম্পর্কে জানা
- অসংক্রামক রোগ সম্পর্কে জানা

- গল্প বলা
- দলীয় আলোচনা

মানব শরীরে পুষ্টির প্রভাবসমূহ

সঠিক পরিমাণে পুষ্টির অভাবে নিম্নলিখিত শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হয়

১. খর্বাকৃতি (Stunting)
২. শারিরীক ক্ষয় (Wasting)
৩. ডায়াবেটিস
৪. হৃদরোগ
৫. অন্ধত্ব
৬. রক্ত স্বল্পতা
৭. ত্বক সংক্রামণ
৮. বিভিন্ন রোগ জীবাণুর আক্রমণ
৯. তীব্র দূর্বলতা
১০. স্নায়ুতন্ত্র গঠনে দূর্বলতা বা ত্রুটি
১১. ক্যান্সার
১২. বিষন্নতা
১৩. কার্যক্ষমতা হ্রাস

অপুষ্টিজনিত প্রভাবসমূহ

১. শারিরীক ক্ষয় (Wasting) ঃ আবশ্যকীয় পুষ্টি সমৃদ্ধ পর্যাপ্ত/পরিমিত খাবার না গ্রহণ করার কারণে দেহে শারিরীক ক্ষয় সাধিত হয়। এতে যে কোন অঙ্গ বিকল হয়ে যেতে পারে। হাড্ডি ভেঙ্গে যেতে পারে এবং হৃদপিন্ড অকেজো হতে পারে।

খর্বাকৃতি (Stunting) সমস্যা ঃ নিম্নলিখিত কারণে খর্বাকৃতি সমস্যার সৃস্টি হয়–

১. জন্মের পর প্রথম ছয়মাস মায়ের বুকের দুধ না খেলে;
২. জন্মের ছয় মাস পর পর্যন্ত পুষ্টি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ না করলে; এবং
৩. গর্ভকালীন ও গর্ভ পরবর্তী মায়ের পুষ্টির অভাব হলে।

নিয়মিত অসুস্থতা ঃ

কারণ ঃ বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ খাবার পর্যাপ্ত না খেলে।

রিকেটস ঃ

কারণ ঃ পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি এবং ফসফরাস উপাদান গ্রহণ না করলে। এর কারণে শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির সময় অস্বাভাবিক আকৃতির হাড় গঠিত হয়।

অন্ধত্ব ঃ

পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন এ পুষ্টি গ্রহণ না করলে

স্থূলতা ঃ

১. অতিরিক্ত মাত্রায় চর্বি ও শর্করা সমৃদ্ধি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য গ্রহণ করলে এবং শারিরীক পরিশ্রম কম করলে দেহে স্থূলতার সৃষ্টি হয়

২. স্থূলতার কারণে ডায়াবেটিকস-২, হৃৎরোগ, উচ্চ রক্তচাপ এবং কতিপয় ক্যান্সার রোগ হয়

ত্বক সংক্রামণ ঃ

ভিটামিন- বি গ্রুপের ভিটামিন পর্যাপ্ত শরীরে পরিশোষণ না ঘটলে ত্বকে সংক্রামণ রোগ দেখা দিতে পারে।

হৃদরোগ ঃ

১. ফ্যাট ও শর্করা সমৃদ্ধ খাবার হতে অতিরিক্ত মাত্রায় কলেষ্টরল গ্রহণ করলে

২. বংশগতভাবে হৃৎপিন্ডের অসুখ থাকলে

৩. হৃদরোগের কারণে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক হয়

অনুশীলন-২ঃ প্রশিক্ষক প্রতিটি দল থেকে ১/২ জনের BMI করে ওজন হীনতা বা স্থূলতা নির্ণয় করবেন এবং এর কারণ অনুসন্ধাসন করবেন।

$$\text{বিএমআই (BMI)} = \frac{\text{ওজন (কেজি)}}{\text{উচ্চতা (মিটার)}^২}$$

বিএমআই সূচকঃ

ওজন কম: < ১৮.৫

স্বাভাবিক: ১৮.৫-২৩

স্থূলতা: ২৩-২৭.৫

অতিরিক্ত ওজন: > ২৭.৫

উপকরণঃ

- ✓ পরিমাপক যন্ত্র
- ✓ এক থালা ভাত
- ✓ দুটি আটার রুটি
- ✓ লাল আটা
- ✓ চিনি
- ✓ লবণ
- ✓ তেল
- ✓ পানি

পুষ্টির বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতার সাধারণ কারণসমূহ

- স্থুলতা (Obesity)
- মাত্রাঅতিরিক্ত ওজন (Over Weight)
- উচ্চ রক্তচাপ
- ডায়াবেটিস-২
- হৃদরোগ

খাদ্য সংক্রান্ত কারণ যেগুলোতে উচ্চ হারে

- ✓ চর্বি বা কোলেস্টেরল
- ✓ কার্বোহাইড্রেট
- ✓ চিনি
- ✓ চর্বি এবং লবণ অথবা
- ✓ কম আঁশযুক্ত খাবার
- ✓ শারীরিক শ্রমের ঘাটতি বা অভাব

গল্প বলা

আমাদের শরীর যদি একটা ছোট্ট শহর হয় তবে এই শহরের প্রধান মাস্তান হচ্ছে কোলেষ্টেরল। এর সাথে কিছু সাঙ্গ পাঙ্গ আছে। তবে প্রধান সহযোগী ট্রাইগ্লিসারাইড। এদের কাজ হচ্ছে রাস্তায় রাস্তায় মাস্তানী করা, মেয়েদের বিরক্ত করা। হৃৎপিন্ড হলো এই শহরের প্রাণকেন্দ্র শহরের সব রাস্তাগুলো এসে মিশেছে প্রাণকেন্দ্রে এসে। মাস্তানের সংখ্যা বেশী হলে কি হয় আপনারা সবাই জানেন। এরা সব রাস্তাগুলো বন্ধ করে দিয়ে শহরের প্রাণকেন্দ্র অচল করে দিবে। আপনিও তখন পটল তুলবেন। না তুললেও মাস্তানদের ধর্মঘটে প্রায়ই আপনার প্রিয় শহরে এমন কিছু ঘটবে যে আপনি বেঁচেও মৃতপ্রায় হয়ে থাকবেন। বিয়েতে হাতের রিং তখনও হয়ত হাতেই আছে সাথে হার্টেও রিং পরতে হবে। আমাদের শরীর নামক শহরে কি পুলিশ নেই? যারা মাস্তানদের ক্রসফায়ার করবে, অথবা জেলে ভরবে। হ্যাঁ, আছে। তার নাম এইচ ডি এল। সে পাড়ায় পাড়ায় মাস্তানী করা এসব মাস্তানদের রাস্তা থেকে তুলে এনে জেলে ভরে রাখে। জেলখানা চিনেন তো? লিভার বা কলিজা হল জেলখানা । লিভার এইগুলোকে বাইল সল্ট (পিত্ত লবন) বানিয়ে শহরের পয়নিষ্কাশন লাইনের মাধ্যমে (পায়খানার সাথে) শহর থেকে বের করে দেয়। কি অদ্ভুত শাস্তি মাস্তানদের। খুব মজা লাগছে তাই না? এইচ ডি এল কে বন্ধু বন্ধু লাগছে তাই না? লিটল ডি এল বা সংক্ষেপে এল ডি এল আবার সমাজের সুবিধাবদী মানুষ সে লবিং করে জেলখানা থেকে কোলেষ্টেরল বা ট্রাইগ্লিসারাইড রুপী মাস্তানদের তুলে এনে আবার রাস্তায় বসিয়ে দেয়। তাদের মাতলামোতে পুরো শরীরে জ্যাম লেগে যায়। আর এলডিএল মুখ টিপে টিপে হাসে। এইচ ডি এল হায় হায় করে দৌড়ে আসে। কিন্তু সে এলডিএল আর মাস্তানদের যৌথ শক্তির সাথে পেরে ওঠেনা। পুলিশের সংখ্যা যত কমে মাস্তানরা ততই উল্লসিত হয়। শহরের পরিবেশ হয়ে ওঠে অস্বাস্থ্যকর। এমন শহর কার ভালো লাগে বলুন? আপনি মাস্তানদের কমিয়ে পুলিশ বাড়াতে চান? তবে হাঁটুন। আপনার প্রতি কদমে এইচডিএল (পুলিশ) বাড়বে, এলডিএল (লবিং করা সুবিধাবদী) কমবে, মাস্তান (কোলেষ্টেরল) কমবে! আপনার শহর (শরীর) প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পাবে। আপনার প্রাণকেন্দ্র (হার্ট) মাস্তানদের অবরোধ (হার্ট ব্লক) থেকে বাঁচবে। আর শহরের প্রাণকেন্দ্র (হার্ট) বাঁচা মানে আপনিও বাঁচবেন। এমন শহর কার ভালো লাগে বলুন? আপনি মাস্তানদের কমিয়ে পুলিশ বাড়াতে চান? তবে হাঁটুন। আপনার প্রতি কদমে এইচডিএল (পুলিশ) বাড়বে, এলডিএল (লবিং করা রাজনীতিবিদ) কমবে, মাস্তান (কোলেষ্টেরল) কমবে! আপনার শহর (শরীর) প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পাবে। আপনার প্রাণকেন্দ্র (হার্ট) মাস্তানদের অবরোধ (হার্ট ব্লক) থেকে বাঁচবে। আর শহরের প্রাণকেন্দ্র (হার্ট) বাঁচা মানে আপনিও বাঁচবেন।

ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস হলো শরীরের এমন একট অবস্থা যখন রক্তে অধিক পরিমাণে গ্লুকোজ প্রবাহমান থাকে ।
গ্লুকোজ ঃ এটি চিনি জাতীয় পদার্থ যেমনঃ- রুটি, বিভিন্ন দানা শস্য, ফল মূল, শাক সবজি ও দুধ খাওয়ার পর যা আমাদের দেহে শর্করা তৈরী করে। যখন আমরা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খাই, তখন আমাদের দেহ সেগুলোকে ভেঙ্গে গ্লুকোজ তৈরী করে।
গ্লুকোজ হলো শক্তির প্রধান উৎস যা আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজন। গ্লুকোজ আমাদের সমস্ত দেহের রক্তে প্রবাহমান এবং এটির মাত্রা খুব অধিক বা খুব কম হওয়া বাঞ্চনীয় নয়।
দেহে শক্তি সঞ্চালনের জন্য গ্লুকোজ রক্তে এবং দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের মধ্যে (যেমনঃ ব্রেইন, হৃদপিন্ড, মাংসপেশী এবং যকৃতে) প্রবাহমান থাকে। ইনসুলিন নামক হরমোন দ্বারা রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের অভ্যন্তরে গ্লুকোজ চলাচল করে। অগ্ন্যাশয় কর্তৃক ইনসুলিন হরমোন তৈরী হয়। ইনসুলিন গ্লুকোজকে দেহের অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে অনুপ্রবেশের নিমিত্ত গ্লুকোজের দ্বারগুলো উন্মুক্ত করে দেয় এবং যার ফলে রক্ত প্রবাহ হতে গ্লুকোজ সঞ্চালিত হয় এবং আমাদের দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে অনুপ্রবেশ করে এবং দেহাভ্যন্তরে শক্তি তৈরী করে।

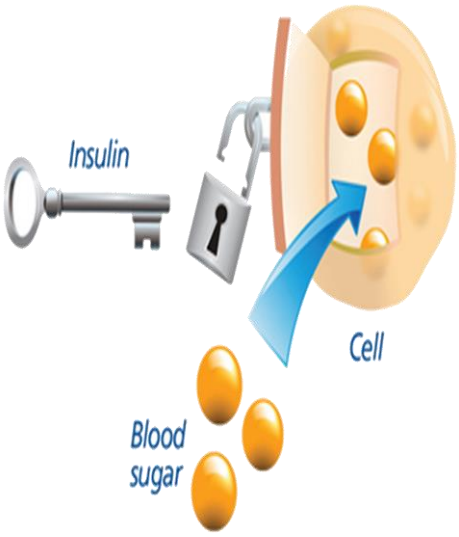

ডায়াবেটিসের কারণে অগ্ন্যাশয়ে নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহ দেখা যায়

- অগ্নাশয় ইনসুলিন তৈরি করতে পারেনা অথবা
- অগ্নাশয় ইনসুলিন তৈরি করতে সমর্থ হলেও এটা সঠিকভাবে কর্মক্ষম হয়না অথবা
- অগ্নাশয় ইনসুলিন তৈরিতে সমর্থ কিন্তু এরূপ অগ্নাশয় দেহের কোষসমূহকে চিনতে বা কর্মক্ষম করতে ব্যর্থ।

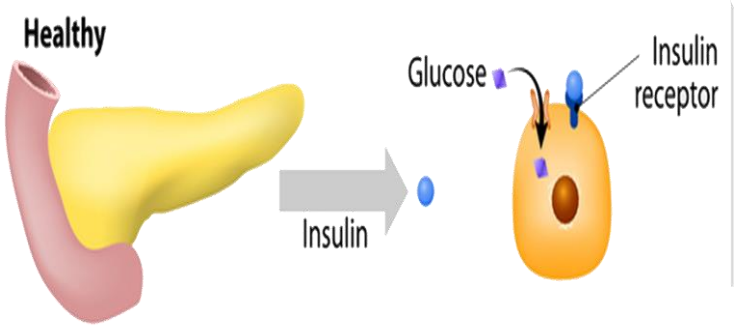

টাইপ-১ ডায়াবেটিস ইনসুলিন নির্ভর

যে সকল ব্যক্তির পরিবারে ডায়াবেটিস হওয়ায় ইতিহাস রয়েছে তাঁদের টাইপ-১ ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি সর্বাধিক বলে বহুলাংশে প্রমাণিত। এটিই একমাত্র চিন্তার কারণ যে, অগ্নাশয়ের অভ্যন্তরে ইনসুলিন উৎপাদনের জন্য যে সকল কোষসমূহ ব্যবহৃত হয় সে সকল কোষসমূহ (বিটা কোষ) তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা হারিয়ে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। পরিবেশগত বিভিন্ন কারণে শরীর হতে এ ধরণের অবস্থার সূত্রপাত ঘটে যদিও এগুলো এখনও অস্পষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় অগ্নাশয়ের অভ্যন্তরে ভাইরাস সংক্রমণের কারণে বিটা কোষসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হতে পারে।

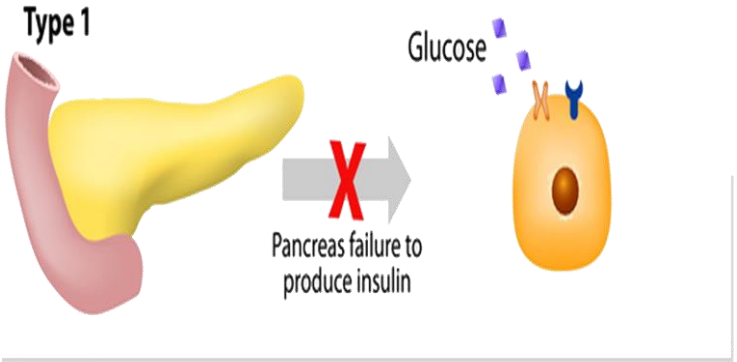

টাইপ-২ ডায়াবেটিস

টাইপ-২ ডায়াবেটিস দ্বারা সাধারণত পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিরা আক্রান্ত হয়ে থাকেন। তবে সাম্প্রতিক কালে ক্রমান্বয়ে অধিক হারে যুবক-যুবতীরা এরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যিনি টাইপ-২ ডায়াবেটিসে ভুগছেন তিনি সাধারণতঃ ইনসুলিন প্রতিরোধী। এর অর্থ এই যে, এরূপ ব্যক্তির দেহে ইনসুলিন উৎপন্ন হয় ঠিকই কিন্তু যেভাবে সেটি কাজ করার কথা সেভাবে কাজ করেনা। এরূপ ব্যক্তির দেহে প্রচুর ইনসুলিন উৎপন্ন হয় ঠিকই কিন্তু প্রকৃত অর্থে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রাকে কাংক্ষিত পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

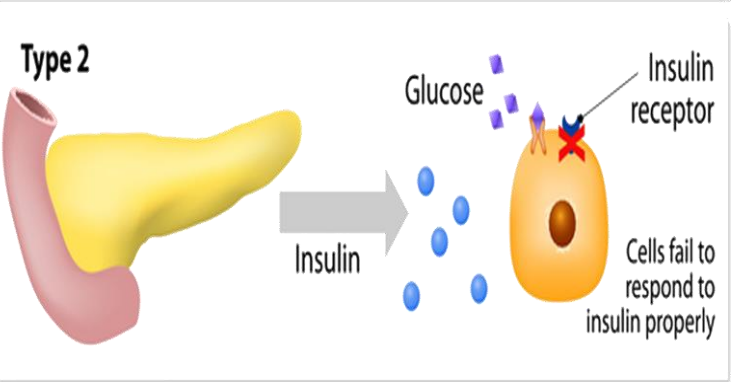

যে সকল ব্যক্তির টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে

- যাদের পরিবারে ডায়াবেটিসের ঐতিহ্য রয়েছে;
- বয়স- বয়স বাড়ার সাথে আক্রান্তের ঝুকিও বাড়বে;
- ৫.৫ কেজি ওজনের উর্ধ্বে যে সকল মহিলা বাচ্চ প্রসব করে থাকেন অথবা গর্ভাবস্থায় যে সকল মহিলা ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন;
- "পলিসিটিক ওভাররিয়ান সিনড্রোম" নামক অবস্থায় যে সকল মহিলা ভুগছেন; এবং
- যে সকল ব্যক্তি উচ্চ মাত্রায় কার্বোহাইড্রেট ও মিষ্টি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ অভ্যাস্থ।

টাইপ-২ ডায়াবেটিসে সচরাচর কোন লক্ষণ দেখা যায় না অথবা লক্ষণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রকাশ পায়। যখন লক্ষণজলা প্রকাশ পায়, সচরাচর সে ক্ষেত্রে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের জটিলতার উপস্থিতি ধরা পড়ে।

সাধারণ লক্ষণসমূহ

- তৃষ্ণার্ত অনুভব করা অথবা স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক ক্ষুধার্ত অনুভব করা
- বেশি বেশি মূত্র ত্যাগ
- দেহে অবশ ভাব এবং পরিশ্রান্ত অনুভব করা
- কাটা (শরীরের) জায়গা ও যাতে দীর্ঘ সময় লাগা
- ক্রমান্বয়ে ওজন বাড়া (টাইপ-২)
- অপ্রত্যাশিতভাবে শরীরের ওজন কমে (টাইপ-১) যাওয়া
- ঝাপসা দেখা, সমস্য ব্যথা করা, মাথা ঘোড়া
- পায়ে খিল (Cramps) ধরা
- মেজাজ নিয়ন্ত্রণ (দোদুল্যমান) না থাকা
- চুলকানি অথবা চর্মরোগ হওয়া

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস

গর্ভাকালীন সময়ে গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস দেখা দেয় এবং বাচ্চ প্রসবের পর এটি দূরীভূত হয়। টাইপ-২ ডায়াবেটিস সাধারণতঃ প্রায় ২৪-২৮ সপ্তাহকালীন সময় থেকে গর্ভাবস্থায় দেখা দেয়। ৫-১০ বছর ব্যাপী সময়ের মধ্যে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুকি বিদ্যমান থাকে।

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিসের ঝুকিতে রয়েছে এমন মহিলাগণ হলেন

- মাত্রারিক্তি ওজনের মহিলা;
- যাদের পরিবারে ডায়াবেটিসের ঐতিহ্য রয়েছে এমন ত্রিশোর্ধ্ব (৩০) বয়সের মহিলা;

ডায়াবেটিসের ব্যবস্থাপনা কিভাবে করতে হয়

- যে কোন ধরণেরই ডায়াবেটিস হোক না কেন প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে তাঁর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নন-ডায়াবেটিক মাত্রার কাছাকাছি ধরে রখার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন;
- যদি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেই রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কাংক্ষিত পর্যায়ে ধ র রাখতে সক্ষম হন তাহলে তারা অত্যাধিক উচ্চ অথবা অত্যাধিক নিম্ন মাত্রার রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পকালীন প্রভাব প্রতিরোধ করতে পারবেন;
- রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কাংক্ষিত পর্যায়ে স্থির/ধরে রাখা সম্ভব হলে রক্তে গ্লুকোজের দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা প্রতিরোধ করা যায়। যেমনঃ- চক্ষু, কিডনী, স্নায়ুবিক সমস্যা, হৃদরোগ ও স্ট্রোক;
- দৈহিক/শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত হওয়া; এবং
- চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ এবং দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিকল্পনা প্রণয়ন।

ডায়াবেটিস রোগীরা কি ধরণের পথ্য খাবে?

- ডায়াবেটিস রোগীদের প্রাত্যহিক পছন্দনীয় খাদ্য তালিকায় অপরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট যেমনঃ- আস্ত দানাদার শস্য অন্তভূক্ত থাকা বাঞ্চনীয়;
- দৈনিক খাদ্য তালিকার সর্বোচ্চ অর্ধেক পরিমাণ আস্ত দানাদার খাদ্য গ্রহণ;
- হাইপোগ্লাইসিমা (ব্লাড সুগারের মাত্রা নিম্নগামিতার ক্ষেত্রে) প্রতিরোধের জন্য খাদ্য গ্রহণকালে প্রতি পরিবেশনে প্রত্যেককে কমপক্ষে দুটি কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করা প্রয়োজন;
- যখন খাদ্য নির্বাচন/পছন্দ করা হবে তখন শর্করা খাদ্যকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে কারণ রক্তে সুগারের মাত্রা প্রকটভাবে এর পরিমাণের উপর নির্ভর করে; এবং
- প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে শাক-সবজি ও ফলমুল গ্রহণকরতে হবে।

যে সকল খাদ্যে অপরিশোধিত শর্করা বা অধিক পরিমাণে আঁশ বিদ্যমান থাকে সেগুলো হলো

- আস্ত দানার ময়দা
- দানাদার শস্য (চাল, গম, ভুট্টা, সালগম, বার্লি)
- শর্করা জাতীয় শাক সবজি (মিষ্টি আলু, আলু, সবুজ ভুট্টা)
- সীম জাতীয় শস্য (সীম, ছোলা, মসুর, মটর, গো-মটর, ছোলা)

পরিশোধিত শর্করা যুক্ত খাদ্য যেগুলো বয়কট করতে হবে

- সাদা রুটি, পলিশ করা চাল
- সাদা ময়দা দ্বারা তৈরী খাদ্য, যেমনঃ- কেক, বিস্কুট

টাইপ-১ এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীর বিশেষ খাদ্য গ্রহণ নির্দেশাবলী

রক্তে গ্লুকোজ স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে বিদ্যমান রাখার নিমিত্ত জনসাধারণকে প্রদেয় পরামর্শ ঃ-

- প্রতিদিন চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করুন এবং দিনব্যাপী সমহারে মেনু পরিকল্পনা করুন;
- নিম্ন চর্বিবিশিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করুন এবং সম্পৃক্ত চর্বিবিশিষ্ট খাদ্য কম খাওয়ার অভ্যাস করুন;
- উচ্চ আঁশ বিশিষ্ট আস্ত দানাদার এবং শর্করা সমৃদ্ধ আস্ত দানাদার খাবার খাওয়ার অভ্যাস করুন। যেমন: রুটি ও দানাদার শস্য, সমুর, ফলমূল ও শাক-সবজি;
- যে সকল খাদ্য চিনি যুক্ত করে খেতে হয় সেগুলো ও চিনিযুক্ত খাদ্য সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করুন;
- রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা সঠিক পর্যায়ে বজায় রাখার জন্য ধীরে ধীরে পরিপাক হয় এমন কার্বোহাইড্রেট বিশিষ্ট খাদ্য নির্বাচন/পছন্দ করুন। যেমনঃ- দানাদার খাদ্য শস্য, ফলমূল ও শাক-সবজি;
- দ্রবণীয় ও অদ্রবনীয় আঁশ বিশিষ্ট খাদ্য নির্বাচন/পছন্দ করুন। যে সকল রোগীর ডায়াবেটিস আছে তাঁদের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা দ্রবণীয় আঁশ বিশিষ্ট খাদ্য উত্তমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলমূল ও শাক-সবজিতে দ্রবণীয় আঁশ পাওয়া যায়;
- শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে আদর্শ ওজন বজায় রাখুন;
- লবণ গ্রহণ সীমিত করুন;
- মদ/এ্যালকোহল গ্রহণ সীমিত করুন;
- দ্রবনীয় ও অদ্রনীয় আশযুক্ত খাদ্য নির্বাচন করতে হবে এবং দ্রবনীয় আশযুক্ত খাদ্য ডায়াবেটিস রোগীর জন্য উত্তম;
- দ্রবনীয় আঁশ ফল ও সবজিতে পাওয়া যায়; এবং
- অদ্রবনীয় আশ দানাদার খাদ্যে বিদ্যমান।

উচ্চ রক্ত চাপ কি?

যখন রক্তের চাপ অত্যাধিক বাড়ে তখন হৃদপিন্ড কঠিন পরিশ্রম করে রক্তকে পাম্প করে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত প্রবাহমান রাখে যার ফলে ব্লাড ভেসেলের দেয়াল ক্ষতি হয়। উচ্চ রক্তচাপের কারণে কিডনীর ক্ষতি হতে পারে। স্ট্রোক হতে পারে এবং হৃদপিন্ড অকার্যকর হয়ে পড়তে পারে। সচারচর কোনরূপ লক্ষণ প্রকাশ ব্যতিরেকেই উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না জটিলতার উৎপত্তি ঘটে।

উচ্চ রক্তচাপের কিছুসংখ্যক লক্ষণাদি নিম্নরূপ হতে পারে ঃ-

- দ্রুত গতিতে নাড়ি স্পন্দন
- মাথা ব্যথা
- শ্বাস প্রশ্বাসে প্রতিবন্ধকতা বা স্বল্প শ্বাস-প্রশ্বাস প্রদাহ
- শরীর ঘেমে যাওয়া

ফ্যাটি লিভার

ফ্যাটি লিভার কোনো উপসর্গ ব্যতীত লিভারের একটি নীরব রোগ, যাতে বিশ্বে ১২% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আক্রান্ত বাংলাদেশে 'ন্যাশ্'-এর প্রাদুর্ভাব ১২%-১৭%। ধারণা করা হচ্ছে এটি ২০২০ সালের মধ্যে লিভার সিরোসিসের অন্যতম প্রধান কারণ হবে।

ভবিষ্যতে রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা উন্নত করার লক্ষ্যে, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকা জনগণের মাঝে একটি সেতুবন্ধন তৈরী করতে হবে এবং তাই সাধারন জনগনের মাঝে এই সচেতনতা তৈরী করা অত্যন্ত জরুরী।

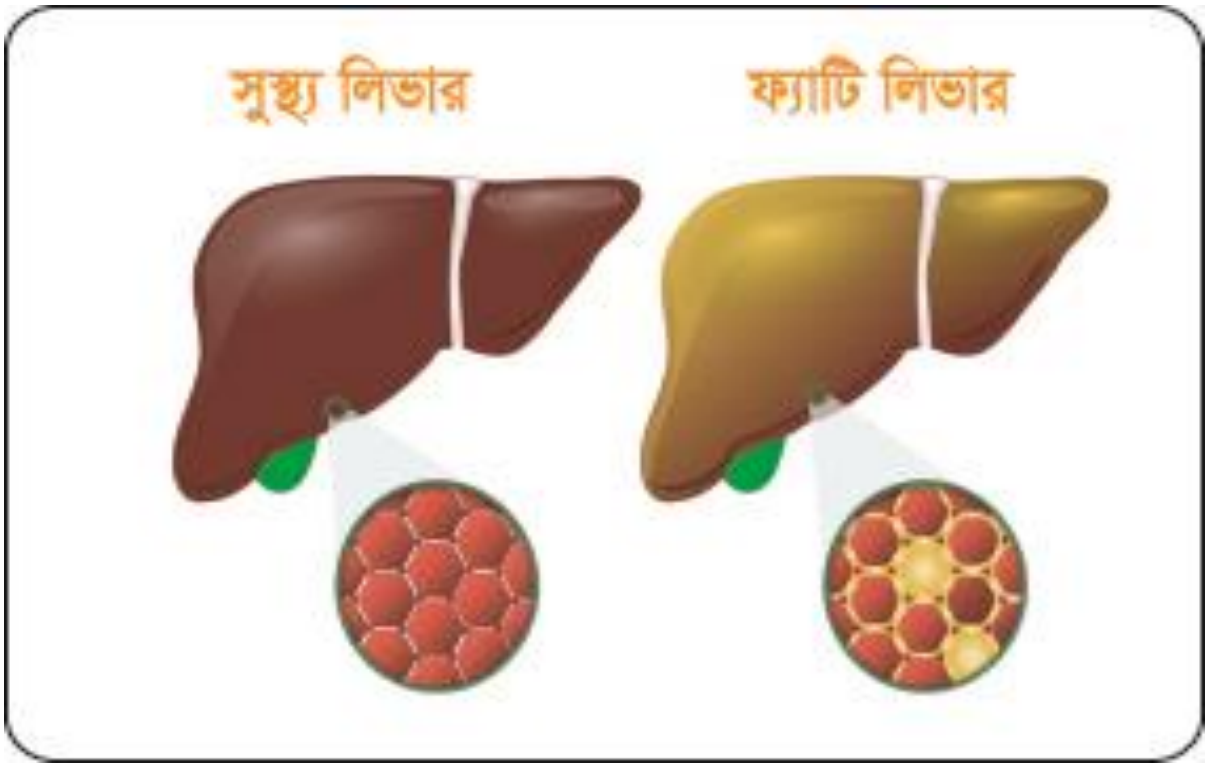

সচেতনতার প্রয়োজন কেন?

- ✓ লিভার মেটাবলিজমের কেন্দ্রবিন্দু। তাই লিভারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা মানে সুস্থ জীবনের জন্য পুরো দেহকে সুরক্ষিত করা।
- ✓ উক্ত ক্যালরিযুক্ত অস্বাস্থ্যকর খাবার এবং শরীরচর্চার অভাবে কি হয় এবং এগুলো কিভাবে লিভার ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি তা মানুষকে জানতে হবে।
- ✓ ফ্যাটি লিভার স্থুলতা এবং ডায়াবেটিসের মতো রোগের সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত। কোন ধরনের উপসর্গ ব্যতীত বাংলাদেশে ১২-১৭% মানুষ এতে আক্রান্ত।
- ✓ সাধারণ মানুষকে জানতে হবে ফ্যাটি লিভার যেকোন সাধারন লিভার রোগ থেকেও বেশি কিছু, যা বিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি।
- ✓ ফ্যাটি লিভার এ আক্রান্ত যাদেরকে এতদিন আমরা গুরুত্ব দেইনি, তাদের কথা এখন শুনতে হবে।

বাংলাদেশে ফ্যাটি লিভার এর ঝুঁকিতে রয়েছে যে জনগোষ্ঠী

- ✓ ফ্যাটি লিভার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অস্বাস্থ্যকর উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাদ্যাভ্যাস এবং শরীরচর্চার অভাবের কারনে হয়ে থাকে।
- ✓ যখন শরীরে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি চিনি এবং চর্বি জাতীয় খাবার গ্রহণ করা হয়, তখন সেটা লিভারের ভিতরে জমা হয়ে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং লিভার কোষে ক্ষত তৈরী করে।
- ✓ স্থূলকায় ব্যক্তিরা ফ্যাটি লিভার এ আক্রান্ত হবার সবচেয়ে বড় ঝুঁকিতে রয়েছে।
- ✓ যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদেরও ফ্যাটি লিভার এ আক্রান্ত হবার ঝুঁকি অত্যাধিক।
- ✓ যারা দিনের বেশিরভাগ সময়ে বসে কাজ করেন তাদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি হয়।
- ✓ গ্রামের নারীদের ঝুঁকির সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- ✓ যে শিশুরা খেলাধুলা, ব্যায়াম করে না ফাস্ট ফুড, কোল্ড ড্রিংকস্, আইসক্রিম, চকলেচ বেশি খায় তাদের ফ্যাটি লিভার হবার ঝুঁকি বেশি।

স্বাস্থ্যে ফ্যাটি লিভার এর প্রভাব

- ✓ ফ্যাটি লিভার থেকে সিরোসিস এবং/অথবা ক্যান্সার হয় এবং পরিণতিতে লিভার নষ্ট হয়।
- ✓ হৃদরোগের উপরও লিভারের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।
- ✓ ফ্যাটি লিভার রোগীদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হৃদরোগ সংক্রান্ত জটিলতা।

সুস্থ লিভার	<৫% ফ্যাটি লিভার কোষ
স্টিয়াটোসিস (ফ্যাটি লিভার)	>৫% ফ্যাটি লিভার কোষ
ফাইব্রোসিস ছাড়া ফ্যাটি লিভার	স্টিয়াটোসিস+ইনফ্লামেশান/প্রদাহ+বেলুনিং
ফাইব্রোসিস সহ ফ্যাটি লিভার	স্টিয়োটোসিস+প্রদাহ+বেলুনিং+ফাইব্রোসিস (১ থেকে ৩)
সিরোসিস অথবা ক্যান্সার অথবা অন্যান্য ফলাফল	এডভান্সড ফাইব্রোসিস (৪)

যখন লিভার সিরোসিস অথবা লিভার ক্যান্সার হয়ে যার, তখন লিভার ট্রান্সপ্লান্টই একমাত্র চিকিৎসা।

ফ্যাটি লিভারে শরীরচর্চার গুরুত্ব

ফ্যাটি লিভার বা লিভার চর্বি রোগে প্রথম করনীয় হলো নিয়ন্ত্রিত কম চর্বিযুক্ত খাবার এবং শরীরচর্চা। গবেষণায় দেখা গেছে যে, শুধুমাত্র ৪ সপ্তাহ ব্যায়ামের মাধ্যমেই লিভারের চর্বি ১৮-২৯ % হ্রাস পায়। পরিমিত খাবার ও শরীরচর্চা সঠিকভাবে ২ বছর পালন করলে লিভারে চর্বি দূর হয়।

শরীরচর্চার ধরন

- ✓ দ্রুত হাঁটা
- ✓ ঘাম ঝরানো হাঁটা
- ✓ ট্রেড মিলে ঘন্টায় ৫-৬ কি.মি গতিতে হাঁটা
- ✓ ধীরে ধীরে দৌঁড়ানো
- ✓ সাইকেল চালানো
- ✓ স্কিপিং (দড়িলাফ) খেলা (সম্ভব হলে)
- ✓ ব্যায়াম এমন খেলাধুলা করা (ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, বাস্কেটবল) ইত্যাদি।

শরীরচর্চার সময়কাল

- ✓ প্রতিদিন শরীরচর্চা লিভারে চর্বি জমতে বাঁধা দেয়।
- ✓ তবে দৈনিক ৩০ মিনিট সপ্তাহে অন্ততপক্ষে ৫ দিন হাঁটা লিভারে চর্বি হ্রাস করে।
- ✓ ব্যায়ামের ক্ষেত্রে দৈনিক ৩০ মিনিট সপ্তাহে অন্ততপক্ষে ৫ দিন।

শরীরচর্চা এমভাবে করতে হবে যেন শরীরের ওজন ধীরে ধীরে ১০ % কমে। এটি যাদের ওজন বেশী তাদের জন্য। যাদের ওজন স্বাভাবিক তাদের ওজন কমাতে হবে না কিন্তু নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে।

ফ্যাটি লিভার রোগে খাদ্য নির্দেশিকা

- ✓ কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ ও সম্পৃক্ত ফ্যাটযুক্ত খাবার বাদ দিতে হবে, যেমনঃ কলিজা, গরু ও খাসীর মাংস, চর্বি, হাঁস-মুরগীর চামড়া, হাড়ের মজ্জা, ঘি, মাখন, ডালডা, মার্জারিন, পাঙ্গাস মাছ, গলদা চিংড়ী, নারকেল ইত্যাদি এর পরিবর্তে অসম্পৃক্ত ফ্যাট যেমনঃ উদ্ভিদ তেল অর্থাৎ সয়াবিন তেল, জলপাই তেল, সূর্যমুখী তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি খাবেন। অতিরিক্ত ট্রান্সফ্যাটযুক্ত খাবার যেমনঃ বেশী তেলে ভাজা খাবার, ঘি দিয়ে ভাজা খাবার, ফাস্টফুড পরিহার করবেন। ওমেগা-৩ ফ্যাটযুক্ত খাবার যেমনঃ সামুদ্রিক মাছ, তিসির তেল, আখরোট, বাদাম ইত্যাদি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

- ✓ অতিরিক্ত শর্করা লিভারে ফ্যাট হিসাবে জমা হয় কাজেই ভাতের ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। দুই বেলা আটার রুটি ও এক বেলা ভাত খাবেন। সাদা চাল ও আটার চেয়ে লাল চাল ও আটা উত্তম। অতিরিক্ত ফ্রুক্টোজ সমৃদ্ধ খাবার পরিহার করবেন যেমনঃ কোকাকোলা, সেভেন আপ জাতীয় সফ্ট ড্রিংকস, কৃত্রিম জুস, চকলেট, সস ইত্যাদি। অতিরিক্ত চিনি, চিনি সমৃদ্ধ খাবার ও মিষ্টান্ন বর্জন করবেন।

- ✓ আঁশবহুল খাবার যেমন সব রকমের ডাল, সবুজ শাকসবজি, টক জাতীয় ফল ইত্যাদি প্রচুর পরিমানে পানি খাবেন। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় কিছু ফল রাখবেন তবে ডায়াবেটিক রোগীদের পাকা আম, পেয়ারা, কাঁঠাল, আতা একটু হিসেব করে খেতে হবে। এছাড়া অধিক ফ্রুক্টোজযুক্ত ফল যেমন- কিসমিস, আলুবোখারা, খেজুর, আঙ্গুরের রস, আম, কাঁঠাল, আপেল ইত্যাদি কম খাবেন। কাল জাম, লেবু, জাম্বুরা, আমলকি, আমড়া ইত্যাদি খেতে বাঁধা নেই। প্রতিদিন ইসবগুলের ভুষি খাওয়া উত্তম যা কোষ্টকাঠিন্য প্রতিরোধের পাশাপাশি শরীরে কোলেস্টেরল কমাতে সহায়তা করে।
- ✓ সর ছাড়া দুধ খাওয়া যাবে। এছাড়া নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় টক দই খাওয়া শরীরের ওজন কমানো সহ স্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্ন উপকারী ভূমিকা পালন করে। হাঁস-মুরগীর ডিম খাওয়া যাবে।

সেশন-৩ঃ অনুপুষ্টি উপাদান সমূহ; আয়োডিন, আয়রন, জিংক এবং ক্যালসিয়াম

উদ্দেশ্য

- আয়োডিন, লৌহ, জিংক এবং ক্যালসিয়ামের অভাবের সাথে পুষ্টিগত সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ
- অনুপুষ্টি উপাদানের অভাব জনিত স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানা

উপকরণ

- গলগন্ড আছে এমন একজন মানুষের
- লেবু
- খোলা লবণ
- বিশুদ্ধ খাবার পানি ২ কাপ
- প্যাকেটযুক্ত লবণ
- ফুড কার্ড ৩ সেট

দলীয় আলোচনা

ব্যবহারিক

মূখ্য পুষ্টি উপাদানসমূহ, যেমন বলদায়ক খাদ্য (শর্করা), বৃদ্ধিদায়ক খাদ্য (আমিষ) এবং অনুপুষ্টির উপাদানসমূহ, যেমন ভিটামিন এবং খনিজ উপাদানসমূহ এসব নিয়েই হয় স্বাস্থ্যকর আহার। এখানে ম্যাক্রো (মূখ্য) বলতে 'বড়' এবং মাইক্রো (অনুপুষ্টি) বলতে 'ছোট' বুঝানো হয়। অনুপুষ্টি উপাদান সমূহ শরীরের অতি অল্প পরিমাণে প্রয়োজন। ভালভাবে কাজ করার জন্য আমাদের শরীরের যে সকল অনুপুষ্টি উপাদানসমূহ প্রয়োজন, এই অধিবেশনে সেগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা হবে। এদের প্রতিটি আমাদের অতি সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন, কিন্তু এগুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ যে নির্দিষ্ট পুষ্টি উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করা না হলে একজন মানুষ অসুস্থ অথবা শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে যেতে পারে।

২. প্রদর্শনী:

একজন প্রশিক্ষণার্থীকে বলুন একটি পরীক্ষা চালাতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য। তাঁকে চোখ বুজতে বলুন। বড় করে এক চিমটি লবণ নিয়ে দুইটি কাপের একটির পানিতে মেশান। প্রশিক্ষণার্থীর চোখ খুলতে এবং দুই কাপের পানি বিশ্লেষণ করতে বলুন।

প্রশ্ন করুন: দুইটি কাপের পানি কি দেখতে ভিন্ন? (না) গন্ধে ভিন্ন? (না) তাকে বলুন দুইটি কাপ থেকে এক চুমুক পানি পান করতে। তাদের কি স্বাদ ভিন্ন? কিভাবে এমন হল?

অন্য অংশগ্রহণকারীদের আপনি কাপে কতটুকুলবণ ঢেলেছেন তা বর্ণনা করতে বলুন। (মাত্র এক চিমটি) এই সামান্য পরিমাণ লবণ যে স্বাদে এতটা পার্থক্য এনেছে তা ব্যাখ্যা করুন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন তাদের বাগানের কথা চিন্তা করতে: বীজ ও চারার উত্তম বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে তারা বাগানে কি দেন?
উল্লেখ করুন যে মানুষের শরীরে অনুপুষ্টি উপাদান সমূহের ভূমিকা হল বাগানে জৈব ও রাসায়নিক সার এবং পানির ভূমিকার মতই: যদি আমরা আমাদের নিজেদের অথবা আমাদের ফসলের সঠিক বৃদ্ধি চাই, আমাদের সঠিক খাদ্যসমূহ খেতে বা দিতে হবে।

৩. আলোচনা:

উল্লেখ করুন যে এই অধিবেশন আয়োডিন এবং আয়রনের উপর দৃষ্টিপাত করবে।

আয়োডিন

১. আলোচনা:

গলগন্ড আছে এমন মানুষের ছবিটি দেখান।

ছবি: গলগন্ড ও মানসিক প্রতিবন্ধী

প্রশ্ন করুন: আপনাদের মাঝে কারো কি; এই সমস্যা আছে এমন কাউকে কখনো দেখেছেন? এই সমস্যার উৎস কি?

গলগন্ড নিয়ে স্থানীয় বিশ্বাস ও কল্পকাহীনি গুলো নিয়ে আলোচনা করুন। উল্লেখ করুন যে খাদ্য এবং যে মাটিতে খাদ্য উৎপাদন হয় তাতে আয়োডিনের অভাব থাকলে গলগন্ড হয়। প্রায়ই ভারি বর্ষণে মাটি ধুয়ে যাওয়ার কারণে এমনটি হয়।

প্রশ্ন করুন: আপনাদের মাঝে কেউ কি এমন কোন শিশুর কথা জানেন যার বুদ্ধিমত্তা কম এবং মানসিক বিকাশ অন্যান্য শিশুদের মত নয়?

মস্তিষ্কের এই সমস্যার উৎস কি?

ব্যাখ্যা করুন যে একজন নারীর গর্ভকালীন খাদ্যে যদি আয়োডিনের অভাব থাকে, তবে তার শিশুর মৃত্যু হতে পারে অথবা সে বোকা বা শ্রবণ ক্ষমতাহীন/ কালা হয়ে জন্ম নিতে পারে। যদি মায়ের গলগন্ড নাও থাকে অর্থাৎ তিনি যদি তার শরীরে আয়োডিনের অভাব সম্পর্কে অবগত নাও হন তারপরও এমনটি হতে পারে।

২. তথ্য যোগান দিনঃ

দুই রকম লবণের ছবি বা নমুনা দেখিয়ে বুঝিয়ে বলুনঃ আয়োডিনের স্বল্পতা

আয়োডিনযুক্ত লবণ

মানুষের আয়োডিন অতি সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন এবং তা পূরণের সবচেয়ে সহজ উপায় হল আয়োডিন যোগ করা হয়েছে এমন লবণ কেনা। বাজারের খোলা লবণ (ছবি বা নমুনা তুলে ধরুন) আয়োডিনযুক্ত নয় প্যাকেটজাত লবণ (ছবি বা নমুনা তুলে ধরুন) আয়োডিনযুক্ত। যেহেতুসকলেই তাদের খাদ্যে লবণ যোগ করেন, সেহেতুসরকার লবণে আয়োডিন যোগ করেন। এর মাধ্যমে মানুষের যেটুকু আয়োডিন প্রয়োজন তা পাওয়া নিশ্চিত হয়। সামুদ্রিক মাছ ও উদ্ভিদ এবং দুধেও আয়োডিন পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ আয়োডিনের জন্য আপনাকে প্রতি সপ্তাহেই সামুদ্রিক মাছ খেতে হবে।

৩. প্রদর্শনী (ঐচ্ছিক):

স্থানীয় আয়োডিনযুক্ত লবণে এটি কাজ করে কিনা অধিবেশনের পূর্বে তা পরীক্ষা করে নিন।
লবণ আয়োডিনযুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করার পদ্ধতিটি অল্প সময়ে প্রদর্শন করুন। একটি ছোট প্লেট/ সাদা কাগজের উপরে ৫টি ভাতের দানা নিন। আয়োডিনযুক্ত লবণ ১ চা চামচ নিয়ে ভাতের সাথে চটকে তার উপরে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস যোগ করুন। আয়োডিনযুক্ত লবণের রঙ পরিবর্তন হবে। এ পদ্ধতিতে লবণ আয়োডিনযুক্ত কিনা তা জানা যায়।

আপনি সহজে ঘরে বসে লবণে আয়োডিন পরীক্ষা করতে পারেন

এক চা চামচ পরিমাণ লবণ নিন এবং চামচের উপরের বাড়তি লবণ আঙ্গুল দিয়ে ফেলে দিন

একটি পরিষ্কার প্লেটে লবণ রাখুন

৫টি ভাতের দানা নিন। লক্ষ্য রাখুন যেন ৫টির বেশী ভাতের দানা না হয়

ভাতের দানা লবণের সাথে ভালভাবে চটকে নিন এবং প্লেটের মাঝখানে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন

লবণ মেশানো ভাতের উপর দু'ফোঁটা লেবুর রস দিন এবং লক্ষ্য করুন। যদি লবণের রং বেগুনী হয় তাহলে আপনার লবণে আয়োডিন আছে

প্রাতিবার লবণ কেনার পর উপরের নিয়মে পরীক্ষা করুন

ছবি: লবণের মান নির্ণয় পদ্ধতি

আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধঃ

যেহেতু দেহে বেশি পরিমাণ আয়োডিন সংরক্ষণ করা যায় না। তাই নিয়মিত এবং অল্প পরিমাণ আয়োডিন গ্রহণ করতে হবে। খাবার লবণের মাধ্যমেই পরিমাণমত আয়োডিন গ্রহণ করা সহজ, কারণ আমরা সবাই প্রতিদিন পরিমাণমত লবণ খাই। আমাদের প্রয়োজন প্রতিদিন ১৫০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন। আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণ লবণ খাই তাতে সাধারণত এই পরিমাণ আয়োডিন থাকে। সবচেয়ে সহজ পথ হলো প্রতিদিনই আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া এবং সব সময় তা পরিবারের সবারই গ্রহণ করা। গৃহপালিত পশুপাখিকেও আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়ানো উচিত। এতে তাদের থেকে প্রাপ্ত মাংস, দুধ, ডিম এ আয়োডিন পাওয়া যাবে। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ খেয়েও আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধ করা যায়।

আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার ও সংরক্ষণঃ

আয়োডিনযুক্ত লবণ রান্নায় এবং খাবারে প্রতিদিনই ব্যবহার করতে হবে। লবণ কেনার সময় অবশ্যই আয়োডিনযুক্ত লবণের প্রতীক চিহ্ন দেখে নিতে হবে। রান্নার শেষ মুহূর্তে লবণ ব্যবহার করা উচিত। অন্যথায় অধিক তাপে আয়োডিনের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বাজারে খোলা লবণ কেনা উচিত না। লবণ গলে গেলে তাতে আয়োডিন থাকে না। লবণ রোদে কিংবা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাতে রাখলে আয়োডিনের পরিমাণ কমে যেতে থাকে। এজন্য লবণ সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ ও প্যাকেট করতে হবে এবং লবণে আয়োডিনের পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আয়োডিনযুক্ত লবণ সূর্য রশ্মি থেকে দূরে ঢাকনাযুক্ত কাঁচের বোতল বা প্লাস্টিকের পাত্রে সংক্ষণ করতে হবে।

আয়রনঃ

১. পরীক্ষা-নিরীক্ষা

অংশগ্রহণকারীদের জোড়াবদ্ধ হয়ে পরস্পরের নখ, জিহ্বা ও দাঁতের মাড়ি এবং চোখের পাতার ভিতরের দিক পরীক্ষা করতে অনুরোধ করুন। তারা দুর্বল এবং ক্লান্ত বোধ করছেন কিনা সে প্রশ্নও করবেন।
প্রশ্ন করুন: যদি একজন মানুষের দাঁতের মাড়ি, চোখের পাতার ভিতরের দিক এবং নখ ফ্যাঁকাসে/ সাদা হয়, তার অর্থ কি? সাথে সাথে যদি তিনি দূর্বল ও ক্লান্ত বোধ করেন তার অর্থ কি?

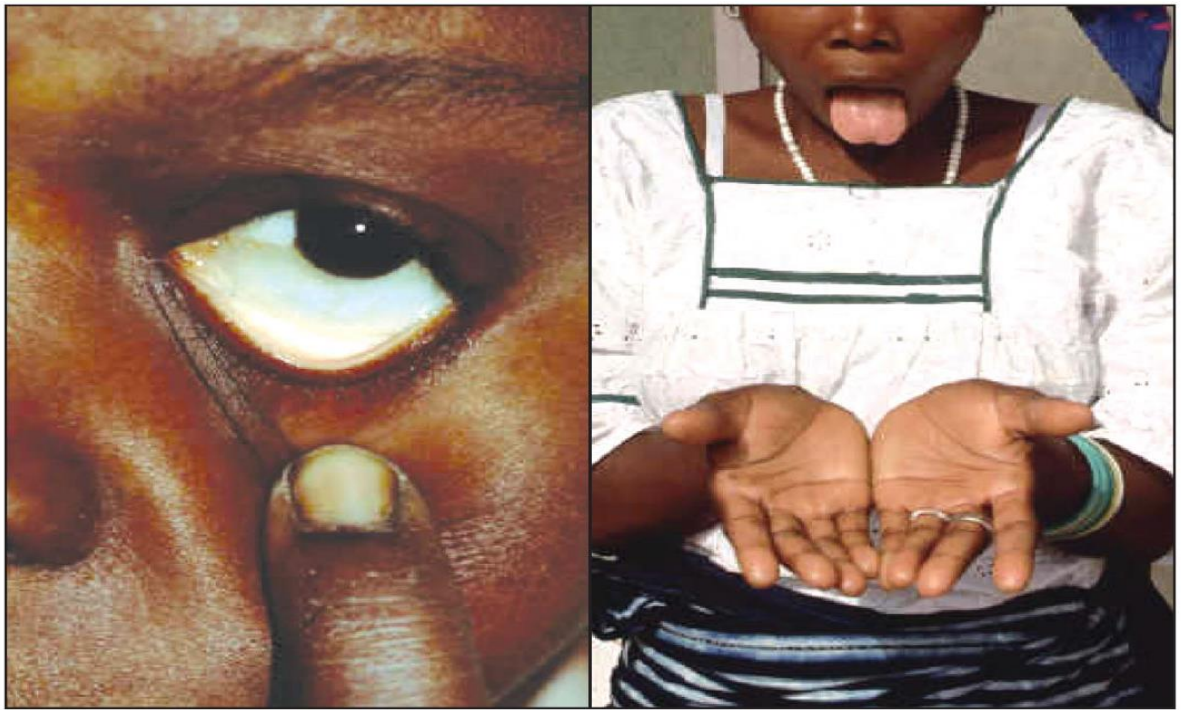

২. তথ্য যোগান দিনঃ

ব্যাখ্যা করুনঃ আয়রনের অভাব যাদের দাঁতের মাড়ি, চোখের পাতার ভিতরের দিক এবং নখ ফ্যাঁকাসে তারা রক্তস্বল্পতায় ভুগতে পারেন। তাদের রক্ত কম এবং এটা তখনই হয় যখন শরীর যে পরিমাণ রক্ত হারায় বা ধ্বংস হয় তা তৈরী না হয়। রক্তস্বল্পতা একটি গুরুতর অবস্থা যা আয়রনের স্বল্পতার কারণে হয়।মাসিক অথবা সন্তান জন্মদানের পর যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন সমৃদ্ধ খাদ্য না খাওয়ার কারণে বহুসংখ্যক নারী রক্তস্বল্পতায় ভোগেন। রক্তস্বল্পতায় ভোগা নারীর গর্ভপাতের আশংকা তুলনামূলকভাবে বেশি। শিশুরা যদি বার বার বা দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়ায় ভোগে অথবা তাদের পেটে যদি গুঁড়াকৃমি থাকে, তবে তারা প্রায়ই রক্তস্বল্পতায় ভোগে। এর ফলে তারা দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং খাবারের রুচি হারায়। বয়স্কদের পায়ের গোড়ালি ও নিম্নাংশ ফুলে যাওয়া সাধারণত রক্তস্বল্পতার লক্ষণ। আয়রন একটি খনিজ উপাদান যা রক্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; হিমোগ্লোবিন তৈরীর জন্য অপরিহার্য। এই হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে মাংসপেশীতে রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন বহন করে, যার কারণে শরীর কর্মক্ষম থাকে। আমাদের শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন না থাকলে আমরা ক্লান্ত ও দূর্বল হয়ে পড়ি, আমাদের বুক ধড়ফড় করে এবং আমরা ভালমত চিন্তা করতে পারিনা।

৩. আলোচনাঃ

প্রশ্ন করুনঃ রক্তস্বল্পতার সম্ভাব্য কারণসমূহ কি কি?

কারণ খোঁজ করুনঃ নিশ্চিত করুন যেন এই কারণগুলো থাকে-

রক্তস্বল্পতার কারণসমূহ

- ✓ কেটে যাওয়া বা ঋতুস্রাবের কারণে রক্ত হারানো ডায়রিয়া বা পেটের অসুখ
- ✓ গুড়া কৃমি
- ✓ অপর্যাপ্ত আহার

৪. ফুড কার্ড সাজানোঃ

প্রশ্ন করুনঃ এই ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি? (সঠিক খাদ্য গ্রহণ)অংশগ্রহণকারীদের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বসতে অনুরোধ করুন; প্রতিটি দলকে এক সেট করে ফুডকার্ড দিন এবং সেগুলোর মধ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন পাওয়ার জন্য একজন মানুষের যেসব খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন সেগুলো বের করতে বলুন।

যে সকল খাদ্য থাকা উচিতঃ

ছবিঃ আয়রনের উদ্ভিজ্জ উৎস

আয়রন সমৃদ্ধ খাদ্যসমূহ:

মাংস (গরু বা ছাগল), কলিজা, মুরগীর মাংস, ডিম, মাছ, ছোট মাছ বিশেষ করে মাথাসহ মলা মাছ, গাঢ় সবুজ পাতাবহুল সবজি, কমলা শাঁসযুক্ত মিষ্টি আলুর শাক, শিম, মটরশুঁটি, ডাল ইত্যাদি। উল্লেখ করুন যে উদ্ভিদজ্জ আয়রন সমৃদ্ধ খাদ্য খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ; এছাড়াও আমাদের নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে শরীর খাদ্যের আয়রন সংগ্রহ করতে পারছে কিনা। ব্যাখ্যা করুন যে আয়রন সমৃদ্ধ খাদ্য খাওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি হল তা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাদ্যের সাথে খাওয়া। এই জাতীয় খাদ্য শরীরকে আয়রন গ্রহণে সহায়তা করে। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাদ্যের উদাহরণ হল- লেবুর রস, কাঁচামরিচ, পেয়ারা, আমলকি, আমড়া, ধনেপাতা ইত্যাদি। প্রাণীজাত খাদ্য থেকে দেহে আয়রন পরিশোষণের মাত্রা প্রায় ৬০%। উদ্ভিদজাত খাদ্য থেকে দেহে আয়রন পরিশোষনের মাত্রা ৪%।

ছবি: আয়রনের প্রাণিজ উৎস

ছবি: আয়রনের উদ্ভিজ্জ উৎস

গুরুত্বপূর্ণ:

আয়োডিন ও আয়রন বিষয়ক প্রধান প্রধান বক্তব্যগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরুন

- একজন গর্ভবতী মহিলা যদি যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিন (আয়োডিনযুক্ত লবণে যা পাওয়া যায়) গ্রহণ না করেন, তবে তার সন্তান বোকা হবে এবং তার কখনও পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশ হবেনা
- যে নারী যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য (মাংস, ছোট মাছ, ডিম, শিম, ফল) খান না, তিনি তাঁর সন্তানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি সমৃদ্ধ দুধ উৎপাদন করতে পারেন না। ফলে তার সন্তানের মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়
- যেহেতুকিশোরী এবং নারীরা প্রায়ই রক্তস্বল্পতায় ভোগেন, সেহেতুতাদের অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে আয়রন সমৃদ্ধ খাদ্য খেতে হবে

জিংক: হচ্ছে এক প্রকার খনিজ উপাদান।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ঃ অপুষ্টিজনিত প্রভাবসমূহ পোস্টার পেপার / ফুড কার্ড এর ছবির মাধ্যমে বুঝিয়ে দিবেন এবং এর প্রতিকার উল্লেখ করবেন ।

জিংক এর উৎস:

প্রাণীজ: মাছ, মাংস, কলিজা, ডিম

উদ্ভিজ: খোসাসহ শস্য, ডাল, বাদাম এবং ঢেঁকি ছাটা চাল

জিংক এর অভাবজনিত সমস্যা:

- ✓ মস্তিস্ক গঠন ব্যাহত হয় ফলে কর্মস্পৃহা এবং স্বরণ শক্তি হ্রাস পায়
- ✓ শিশুদের ডায়রিয়া হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়
- ✓ জননাঙ্গের গঠন ও বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে হয়না
- ✓ হাড়ের পরিপক্কতা ব্যাহত হয়

ক্যালসিয়াম:

শরীরের প্রয়োজনীয় খনিজ গুলোর মধ্যে অন্যতম ক্যালসিয়াম।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ঃ অপুষ্টিজনিত প্রভাবসমূহ পোস্টার পেপার / ফুড কার্ড এর ছবির মাধ্যমে বুঝিয়ে দিবেন এবং এর প্রতিকার উল্লেখ করবেন ।

ক্যালসিয়াম এর উৎস: প্রধান উৎস - দুধ, মায়ের দুধের চেয়ে গরুর দুধে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ অনেক বেশী থাকলেও মায়ের দুধ শিশুর জন্য ক্যালসিয়ামের সবচেয়ে উত্তম উৎস কারণ এটি শরীরে দ্রুত শোষিত হয়। এছাড়াও ক্যালসিয়াম অনেক খাবারেই পাওয়া যায় যেমন- দুধ জাতীয় পণ্য (পনির, মাখন, দই), ডিম এবং মাছ।

ক্যালসিয়াম এর অভাবজনিত সমস্যা:

- ✓ হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত হয়না
- ✓ রক্ত জমাট বাধতে বাধাপ্রাপ্ত হয়
- ✓ মাংসপেশীর সংকোচন বাধাপ্রাপ্ত হয়
- ✓ হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকারিতা বাধাপ্রাপ্ত হয়
- ✓ মায়ের দুধ উৎপাদন ব্যাহত হয়
- ✓ বয়স্ক মহিলাদের হাঁড়ের ক্ষয় রোধ (অস্টিওম্যালেসিয়া) দেখা দেয়

ক্যালসিয়াম এর অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ:

গর্ভকালীন সময়ে এবং ৪০ বছরের পর বেশী পরিমাণে দুধ বা দুধ জাতীয় খাবার খেতে হবে।

সেশন-৪ঃ মানবদেহের পুষ্টির জন্য প্রাণিসম্পদের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

- মানব পুষ্টিতে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের ভূমিকা সম্পর্কে জানা

উপকরণ

- ফেস্টুন
- ভাল ডিম ও খারাপ ডিম
- রিফ্রাকেটা মিটার

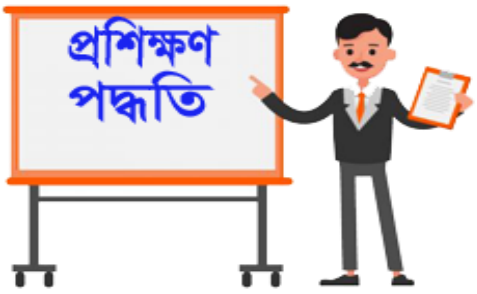

- পদ্ধতি প্রদর্শন
- আলোচনা

ডিমের পুষ্টিগুণ

চোখ
লুটেইন (Lutein) এবং জিয়াজারথিন (Zeazarthin) নামক ক্যারোটিনয়েড ডিমের কুসুমে পাওয়া যায়, যা দৃষ্টি শক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
মস্তিষ্ক
ডিম কোলিন-এর উত্তম উৎস, যা মস্তিষ্ক উন্নয়নে ও স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলীতে জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
মাংসপেশী
ডিমে উত্তম প্রোটিন থাকে যা মাংসপেশী গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ।
হৃৎপিন্ড
বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদায় সুষম খাবারের অংশ হিসাবে ডিম রাখলে তা হৃৎপিন্ডের উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে না।
পাকস্থলী
একটি ডিমে প্রায় ৬ গ্রাম উত্তম আমিষ পাওয়া যায়, যা সহজে ক্ষুদা দূর করে।
রক্ত
ডিমে বিদ্যমান কোলেস্টেরল রক্তের কোলেস্টেরলের উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না।
হাড় গঠন
ভিটামিন-ডি এর উত্তম উৎস যা হাড় গঠনে সাহায্য করে।

ফার্মের মুরগীর ডিম, দেশী মুরগীর ডিম ও হাঁসের **ডিমের পুষ্টিমান**

পুষ্টি উপাদানের নাম	ফার্মের মুরগীর ডিম (কাঁচা)	দেশী মুরগীর ডিম (কাঁচা)	হাঁসের ডিম (কাঁচা)
শক্তি (কি:ক্যা:)	১৩৯	১৫৮	১৮৮
আমিষ (গ্রাম)	১৪.৫	১৩.৩	১৩.৫
ফ্যাট (গ্রাম)	৯.০	১১.৬	১৪.৩
ক্যালসিয়াম (মি:গ্রা:)	২৯	৬০	৬৫
আয়রন (মি:গ্রা:)	১.৫	১.৭	২.৪
ম্যাগনেসিয়াম (মি:গ্রা:)	২১	১১	১১
ফসফরাস (মি:গ্রা:)	২২০	২২০	২২০
পটাশিয়াম (মি:গ্রা:)	১১০	৯৭	২২২
সোডিয়াম (মি:গ্রা:)	১১৬	১৩৫	১৩৪
জিঙ্ক (মি:গ্রা:)	২.৩৬	২.০৩	১.৪১
কপার (মি:গ্রা:)	০.৩০	০.৩০	০.০৬
ভিটামিন-এ (মাইক্রোগ্রাম)	১৬৫	২১৩	৩৬২
ভিটামিন-ডি (মাইক্রোগ্রাম)	১.৯	২.৪	৩.৪
ভিটামিন-ই (মি:গ্রা:)	০.৮৩	১.২	১.৩৯
থায়ামিন (মি:গ্রা:)	০.১৮	০.১৮	০.১২
রিবোফ্লাভিন (মি:গ্রা:)	০.৪০	০.৪০	০.২৬
নায়াসিন (মি:গ্রা:)	৩.৮	৩.৮	৪.৭
ভিটামিন-বি৬ (মি:গ্রা:)	০.১৪৯	০.১৪৯	০.২৫০
ফোলেট (মি:গ্রা:)	৫০	৫০	৮০

কাঁচা ডিম ও রন্ধনকৃত ডিমের পুষ্টিমানের তুলনা

১. কাঁচা ডিম থেকে রন্ধনকৃত ডিমের পুষ্টিমান অনেক বেশী-
২. ডিমের জীবতাত্ত্বিকমান (৯৭.৩%) মাছ (৭৬%) এবং মাংসের (৮০%) থেকে অনেক বেশী;
৩. কাঁচা ডিমে বিদ্যমান অ্যাবায়োটিন প্রোটিন বায়োটিন ভিটামিনকে আটকে রাখে। কিন্তু রন্ধনকৃত ডিমে এই অ্যাবায়োটিন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়;
৪. কাঁচা ডিমে ট্রিপসিন ইনহেভিটর (Inhavitor) বিদ্যমান যা প্রোটিন জাতীয় খাদ্যর পরিপাক ব্যাহত করে। রন্ধনকৃত ডিমে ট্রিপসিন ইনহেবিটর (Inhavitor) নিষক্রিয় হয়ে যায়।
৫. রন্ধনকৃত ডিম দ্রুত শরীরে হজম হয়।

টেবিলঃ বিভিন্ন রন্ধন প্রক্রিয়ায় মুরগীর ডিমের পুষ্টিগুণ

নাম	কাঁচা সম্পূর্ণ ডিম	আধা সিদ্ধ সম্পূর্ণ ডিম	পুরোপুরি সিদ্ধ ডিম
শক্তি (কিলো ক্যালরী/১০০ গ্রাম)	১৪০[১]; ১৪০[২]	১৪২; ১৪৩	১৩৪; ১৫৫
প্রোটিন (গ্রাম /১০০গ্রাম)	১২.৭; ১২.৫৬	১২.২; ১২.৫১	১৩.৫; ১২.৫৮
শর্করা (গ্রাম /১০০গ্রাম)	০.২৭; ০.৭২	১.০৮; ০.৭১	০.৫২, ১.১২
ফ্যাট (গ্রাম /১০০গ্রাম)	৯.৮৩; ৯.৫১	৯.৮২; ৯.৪৭	৮.৬২; ১০.৬১
ফ্যাটি এসিড সম্পৃক্ত (গ্রাম /১০০গ্রাম)	২.৬৪; ৩.১২৬	৩.১১; ৩.১১	২.৫৫; ৩.২৬
ফ্যাটি এসিড মনোস্যাচুরেটেড (গ্রাম /১০০গ্রাম)	৩.৬৬; ৩.৬৫	৩.৬; ৪.৪২	৩.৫৭; ৪.০৭
ফ্যাটি এসিড পলিস্যাচুরেটেড (গ্রাম/১০০ গ্রাম)	১.৬৫; ১.৯১	১.২৮; ১.৯	১.০৩; ১.৪১
কোলেস্টরল (মিলিগ্রাম/১০০গ্রাম)	৩৭২; ৩৯৮	২২২; ৩৭০	৩৫৫; ৩৭৩
লবন (গ্রাম/১০০গ্রাম)	০.৩১	০.২	০.৩১
ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম/১০০গ্রাম)	৭৬.৮; ৫৬	১৫০; ৫৬	৪১;৫০
পটাশিয়াম (মিলিগ্রাম/১০০গ্রাম)	১৩৪; ১৩৮	১৬৪; ১৩৮	১২০; ১২৬
সেলেনিয়াম (মাইক্রোগ্রাম/১০০গ্রাম)	৩০	২৩.৮	৭.০১
ভিটামিন-এ, রেটিনল (মাইক্রোগ্রাম/১০০ গ্রাম)	১৮২; ১৬০	১৩২; ১৬০	৬১.৫; ১৪৯
ভিটামিন-ডি (মাইক্রোগ্রাম/১০০গ্রাম)	১.৮৮; ২.০	১.২৪; ২.০	১.১২; ২.২
ভিটামিন-ই (মিলিগ্রাম/১০০গ্রাম)	১.৪৩; ১.০৫	২.১৭; ১.০৪	১.০৩; ১.০৩
কোলিন (মিলিগ্রাম/১০০গ্রাম)	২৫০; ২৯৩.৮		২৩০;২৯৩.৮

প্রোল্ট্রি পালনে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ও সতর্কতাঃ

সঠিক নিয়মে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রোল্ট্রির উৎপাদন বেড়ে যায়। কারণ, রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং মৃত্যুর হার হ্রাস পায়। কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিতভাবে ও সঠিক নিয়মে করতে হবে। নয়ত মানবদেহে ও পরিবেশের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের চেয়ে নিয়মমত টীকা প্রদান করা উত্তম এবং খরচ কম। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার-এর ২ সপ্তাহের মধ্যে ডিম বিক্রি করা বা খাওয়া উচিত নয়। মাংশের মধ্যে বিদ্যমান অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ শরীরে অ্যালার্জী সৃষ্টি করে এবং দেহের পৌষ্টিকতন্ত্রের প্রাকৃতিক উপকারী ব্যাকটেরিয়া সমূহের ক্ষতি করে।

দুধের পুষ্টিগুণ

দুধ হচ্ছে ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি১২, রিবোফ্লাভিন, ফোলেট এবং ক্যালসিয়াম এর উত্তম উৎস। ভিটামিন-এ চোখের দৃষ্টি শক্তি ও দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় কাযকারী ভূমিকা পালন করে। দেহের প্রতিটি কোষের বিপাক ক্রিয়ার জন্য ভিটামিন-বি১২ এর প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। বিশেষ করে মস্তিস্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন। এছারা ভিটামিন-বি১২ লোহিত রক্ত কণিকা তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। লোহিত রক্ত কণিকা গঠনে ফোলেট-এর ভূমিকা অপরিসীম। এছারা গভাবস্থায় এবং শৈশবকালে নিউরাল গঠন এবং দ্রুত কোষ বৃদ্ধির জন্য ফোলেট আবশ্যক। ক্যালসিয়াম হাড় গঠনে অন্যতম উপাদান।

দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের নিরাপদ বিষয়াদি

- ✓ দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যসমূহে বিভিন্ন ধরনের অনুজীবসমূহের বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত স্থান।
- ✓ কিছু কিছু জীবাণু আছে যারা পাস্তুরিত করা কিংবা ফ্রিজে নিজেদেরকে বাচিয়ে রাখতে সক্ষম।

দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি দূষিত হওয়ার মূল কারনসমূহ

টেবিলঃ দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্যর নিরাপত্তা বিষয়ক বিপত্তিসমূহ (Hazard)	
ক্রমিক নং	**জীব ঘটিত বিপত্তি (Biological Hazard)**
১.	প্যাথোজনিক ব্যাকটেরিয়া (টক্সিন উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া)
২.	ছত্রাক/মল্ড
৩.	পরজীবি
৪.	ভাইরাস
৫.	অন্যান্য

টেবিলঃ দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্যর নিরাপত্তা বিষয়ক বিপত্তিসমূহ (Hazard)	
ক্রমিক নং	**রাসায়নিক বিপত্তি (Chemical Hazard)**
১.	প্রাকৃতিক টক্সিন
২.	খাদ্যে সংযোজিত দ্রব্য/রঞ্জক দ্রব্য
৩.	বালাইনাশকের অবশেষ প্রভাব
৪.	ভেটিরিনারী জাতীয় ঔষধের অবশেষ
৫.	পরিবেশগত দূষক
৬.	প্যাকেজিং পদার্থ হতে সংক্রামক

টেবিলঃ দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্যর নিরাপত্তা বিষয়ক বিপত্তিসমূহ (Hazard)	
ক্রমিক নং	রাসায়নিক বিপত্তি (Chemical Hazard)
১.	ধাতুর টুকরা
২.	হাড়ের ভাঙ্গা অংশ
৩.	কাঁচের টুকরা
৪.	কীটপতঙ্গের অংশ
৫.	পাথর/নূড়ি
৬.	চুল
৭.	জুয়েলারী দ্রব্যসমূহ

দুধ এবং দুগ্ধ জাতীয় খাদ্যের সংক্রামন সংক্রান্ত অনুজীবসমূহ

জীবাণু	আক্রমনের প্রধান উৎস	ফার্মে নিয়ন্ত্রণের উপায়	দুধ বা দুগ্ধজাতীয় খাদ্য
Bacillus cereus	দুধের মাধ্যমে	কার্যকারী কোন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নেই।	উত্তম প্রক্রিয়াকরণ এবং সঠিক পরিচ্ছন্নতা নিশ্চতকরণ। খাদ্যসমূহকে >৬০° সেঃ উপরে বা <৪০° সেঃ এর নীচে রাখা।
E. coli	কাঁচা দুধের মাধ্যমে	পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ। প্রাণির এবং খামারের বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা।	দুধের পাস্তুরাইজেশন। প্রক্রিয়াকরণের সময় উত্তম ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা।
Listeria Monocytogenes	কাঁচা দুধের মাধ্যমে ও নরম পনিরের মাধ্যমে	খামারের স্থানসমূহ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ।	দুধের পাস্তুরাইজেশন ওউত্তমরূপে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা।
Salmonella ssp	কাঁচা দুধের মাধ্যমে	পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ। প্রাণির এবং খামারের বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা।	দুধের পাস্তুরাইজেশন। প্রক্রিয়াকরণের সময় উত্তম ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা।
Staphylococcus aureus	কাঁচা দুধের মাধ্যমে	গো-দহনের সময় পরিচ্ছন্নতা স্তনপ্রদাহ নিয়ন্ত্রণ।	দুধের পাস্তুরাইজেশন ও উত্তমরুপে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে প্রক্রিয়াকরণ।

প্রতিদিনের দুধের চাহিদা

প্রকার	বয়স	পরিমাণ	মন্তব্য
নবজাতক শিশু	৬-১২ মাস	৫ বার	প্রতিবার ১০০ মি. লি. দুধ
শিশু	১-৯ বছর	৫ বার	প্রতিবার ১০০ মি. লি. দুধ
কিশোর/কিশোরী	১০-১৮ বছর	৫ বার	প্রতিবার ১০০ মি. লি. দুধ
পূর্ণবয়স্ক		৩ বার	প্রতিবার ১০০ মি. লি. দুধ
গর্ভবতী মহিলা ও দুগ্ধ প্রদানকারী মা		৫ বার	প্রতিবার ১০০ মি. লি. দুধ

মাংসের পুষ্টিগুণ

ঈদে অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় খাওয়া-দাওয়া। ঈদের আনন্দ ভিন্ন মাত্রা পায় মাংসের বাহারী সব রান্নায়। মাংসের নানারকম সুস্বাদু এবং জিভে জল এনে দেয়া লোভনীয় ব্যঞ্জনে বিভোর থাকতেই কেটে যায় ঈদ পরবর্তী ক'টা দিন। এই সময় আমাদের অনেকেরই মাথায় থাকে না খাবারের পুষ্টিগুণ কিংবা অতিরিক্ত খাওয়ার অপকারিতার কথা। ঘরে বা আত্মীয়স্বজনের বাসায় বিচিত্র চেহারা আর স্বাদের মাংসের ভিড়ে আমাদের মনেই থাকে না কোন মাংসটি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, আর কোনটি ক্ষতিকর; কোনটি বেশি উপকারী, কোনটি কম উপকারী।

মাংস রাসায়নিকভাবে প্রোটিন, চর্বি, বিপুল পরিমাণ পানি নিয়ে গঠিত। প্রাপ্তবয়স্ক কোনো স্তন্যপায়ী জীবের মাংসে সাধারণত ৭৫ শতাংশ পানি, ১৯ শতাংশ প্রোটিন, ২.৫ শতাংশ চর্বি, ১.২ শতাংশ শর্করা এবং ২.৩ শতাংশ এমিনো অ্যাসিডসহ অন্যান্য নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ থাকে। মাংসে বিদ্যমান প্রধান দুটি পেশী প্রোটিন হচ্ছে- এক্টিন ও মায়োসিন। এছাড়া আছে কোলাজেন এবং ইলাস্টিন নামক প্রোটিন।

মাংসকে মোটা দাগে দু'ভাগে ভাগ করা যায়-

- ✓ রেড ও
- ✓ হোয়াইট মিট।

মাংসে মায়োগোবিনের (এক ধরনের প্রোটিন) উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে মূলত এই শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

যেসব মাংসে মায়োগ্লোবিন বেশি থাকে, সেসব মাংসের মায়োগোবিন বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে লাল অক্সিহিমোগ্লোবিন তৈরি করে, ফলে মাংসটি লালচে বর্ণ ধারণ করে। এজন্যই এদের রেড মিট বলা হয়। গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি সব স্তন্যপায়ীর মাংসই রেড মিট। মুরগির মাংস হচ্ছে হোয়াইট মিট।

গরুর মাংস

গরুর মাংসের স্বাদ আর ঘ্রাণ দুটোই অতুলনীয়। উপলক্ষ্য যখন কোরবানির ঈদ, তখন গরুর মাংসের আবেদন যেন আরও বেশি বেড়ে যায়। গরুর মাংস খাওয়ার এমন সূবর্ণ সুযোগ ছাড়তে চান না কেউই।

কিছু স্বাস্থ্যঝুঁকি থাকলেও গরুর মাংস আসলেই খুব স্বাস্থ্যকর খাবার। প্রতি ১০০ গ্রাম গরুর মাংসে রয়েছে ২১৭ ক্যালরি শক্তি। পাতলা স্লাইসের গরুর মাংসে আমিষের পরিমাণ ২৬-২৭ শতাংশ। গরুর মাংস প্রাণীজ আমিষের সমৃদ্ধ উৎস। এতে ৮টি প্রয়োজনীয় এমিনো এসিডের প্রত্যেকটিই থাকে, যা দেহের বৃদ্ধি এবং ক্ষয়পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গরুর মাংসে চর্বির পরিমাণ বেশ কিছু বিষয়ের উপর নিভর করে। যেমন- গরুর বয়স, লিঙ্গ, কেমন খাবার খাওয়ানো হয়েছে প্রভৃতি। মাংসে চর্বির উপস্থিতি মাংসের ঘ্রাণ আনার সাথে সাথে ক্যালরির পরিমাণও বাড়ায়। চর্বি কম থাকলে সেই মাংসকে বলা হয় Lean Meat। সাধারণ মাংসে চর্বি যেখানে থাকে প্রায় ১৬ ভাগ, সেখানে এই লিন মিটে চর্বি থাকে মাত্র ৫-১০ ভাগ।

গরুর মাংসে সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত চর্বির পরিমাণ প্রায় সমান সমান থাকে। এতে উপস্থিত ফ্যাটি এসিডের মধ্যে রয়েছে স্টিয়ারিক এসিড, ওলিক এসিড ও পামিটিক এসিড। গরুর মাংসে ট্রান্স ফ্যাটও রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কনজুগেটেড লিনোলেয়িক এসিড। এই ফ্যাটি এসিডটি ওজন কমাতে সাহায্য করে। তবে অতিরিক্ত চর্বি খাওয়া সবসময়ই খারাপ। এতে বিপাকীয় বিপর্যয়ে পড়তে হতে পারে আপনাকে।

গরুর মাংস খনিজ লবণের চমৎকার উৎস। এতে রয়েছে জিংক, ফসফরাস, সেলেনিয়াম এবং বিপুল পরিমাণ লৌহ। গরুর মাংস গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিনেরও উৎস। ভিটামিন বি-৩, বি-৬, বি-১২ প্রভৃতি ভিটামিনের সরবরাহ পেতে পারেন গরুর মাংস থেকে।

ভাবছেন, এতকিছু বলা হলো গরুর মাংস নিয়ে, কিন্তু যে কোলেস্টেরলের জন্য বিখ্যাত এটি, সেটা গেল কই! হ্যাঁ, গরুর মাংসে কোলেস্টেরল থাকে। আপনি যদি ইতোমধ্যেই অতিরিক্ত কোলস্টেরলের বদান্যতায় ফ্যাটি লিভারের শিকার না হয়ে থাকেন, তাহলে এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। খাবারের মাধ্যমে এই কোলেস্টেরল গ্রহণ করা হয় বলে এটি শরীরে তেমন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে না।

গরুর মাংস হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়, এমন ধারণার সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। কোনো কোনো গবেষণায় দেখা গেছে, রেড মিট হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়, তবে সেটা প্রক্রিয়াজাতকৃত হলে। তাজা মাংস খেলে এই ঝুঁকি একটু হলেও কম থাকে। আবার কোনো কোনো গবেষণায় গরুর মাংস খাওয়ার সাথে হৃদরোগের সম্পৃক্ততার তেমন জোরালো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে চর্বিযুক্ত গরুর মাংস রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়ায়, আর কোলেস্টেরল বৃদ্ধিতে বিপদ ঘটতেই পারে। সব মিলিয়ে বলা যায়, গরুর মাংস খেতে পারেন, তবে চর্বি থেকে দূরে থাকুন।

খাসির মাংস

ছাগলের মাংসে গরুর মাংসের তুলনায় কিছুটা কড়া ঘ্রাণের কারণে স্বাদে একটু পিছিয়ে থাকলেও পিছিয়ে নেই পুষ্টিগুণে। বরং গরুর মাংসের তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর ছাগলের মাংস। ছাগলের মাংসে গরুর মাংসের তুলনায় ক্যালরি, সম্পৃক্ত চর্বি ও কোলেস্টেরলের পরিমাণ অনেকটাই কম হওয়ায়, তেমন কোনো স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই এর। তাই আপনি ইচ্ছেমতো ছাগলের মাংস খেতে পারেন।

ছাগলের মাংসে চর্বি এমনিতে কম হওয়ায় পাতলা স্লাইস করে লিন মাংস বানাতে হয় না। সম্পৃক্ত চর্বি কম বলে রক্তে এটি কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে আপনাকে বিপদে ফেলতেও পারবে না। এছাড়া ছাগলের মাংসে সোডিয়ামের পরিমাণ কম থাকে, পটাশিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকে। এই গুণটি খাদ্য হিসেবে ছাগলের মাংসের স্বাস্থ্য উপকারিতা বাড়িয়ে দিয়েছে ।

প্রতি ১০০ গ্রাম ছাগলের মাংসে থাকে ১২২ ক্যালরি শক্তি, ২৩ গ্রাম প্রোটিন ও ২.৫৮ গ্রাম চর্বি। এছাড়া রয়েছে উচ্চমাত্রার লৌহ, যা রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ করে।

ভেড়ার মাংস

ভেড়ার মাংস উচ্চমাত্রার ক্যালরি সমৃদ্ধ উন্নতমানের আমিষ জাতীয় খাবার।প্রতি ১০০ গ্রাম ভেড়ার মাংসে থাকে ২৫৮ ক্যালরি শক্তি। রান্না করা পাতলা টুকরোর ভেড়ার মাংসে ২৫-২৬ শতাংশ আমিষ থাকতে পারে। ভেড়ার মাংসে চর্বির পরিমাণ গরুর মাংসের চেয়েও বেশি, ১৭-২১ শতাংশ। সম্পৃক্ত চর্বির আশঙ্কাজনক মাত্রার ফলে ভেড়ার মাংস হার্ট এটাক, স্ট্রোক, হাইপারটেনশন প্রভৃতি হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। তবে প্রচুর পরিমাণে খনিজ লবণ আর ভিটামিনের উপস্থিতিও ভেড়ার মাংসে লক্ষ্যণীয়।

মহিষের মাংস

পরিমিত পরিমাণের ক্যালরি ও কোলেস্টেরল এবং উচ্চমাত্রার ভিটামিন ও খনিজ লবণ নিয়ে গঠিত মহিষের মাংস সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর একটি খাবার। প্রতি ১০০ গ্রাম মহিষের মাংসে ১৪০ ক্যালরি শক্তি থাকে। চর্বি ও কোলেস্টেরলের পরিমাণ অবিশ্বাস্য কম হওয়ায় নির্দ্বিধায় আপনি মহিষের মাংস খেতে পারেন।

যে মাংসই খান না কেনো, রান্নার প্রক্রিয়াটি হওয়া চাই স্বাস্থ্যকর। খুব বেশি তাপমাত্রায় রান্না করলে মাংসের পুষ্টিগুণ তো নষ্ট হবেই, সাথে সাথে উড়ে এসে জুড়ে বসবে কিছু বিষাক্ত, ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান। তাই রান্না করতে হবে অল্প আঁচে, ধীরে ধীরে। অতিরিক্ত রান্না করা খাবার এড়িয়ে চলুন।

হাঁসের মাংস

শীতকালে হাঁসের মাংস খেতে সুস্বাদু হয়। এ সময় সবাই কমবেশি হাঁসের মাংস খায়। নানাভাবেই হাঁসের মাংস রান্না করা যায়। হাঁসের মাংস প্রোটিনের ভালো উৎস। এতে নিয়াসিন, ফসফরাস, রিবোফ্লোবিন, আয়রন, জিংক, ভিটামিন বি৬ এবং থায়ামিন আছে। এ ছাড়া অল্প পরিমাণে আছে ভিটামিন বি১২ এবং ম্যাগনেশিয়াম। চামড়াসহ হাঁসের মাংসে অধিক মাত্রায় ফ্যাট এবং কোলেস্টেরলও আছে।

গরুর মাংসের চেয়ে হাঁসের মাংসে চর্বির পরিমাণ বেশি। এই চবি মধ্যে সম্পৃক্ত চর্বির পাশাপাশি অসম্পৃক্ত চর্বিও রয়েছে। সম্পৃক্ত চর্বিতে আছে কোলেস্টেরল। খনিজ উপাদানের মধ্যে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, সোডিয়াম, জিংক, কপার, ম্যাগনেসিয়াম ও সেলেনিয়াম আছে। হাঁসের মাংসের মধ্যে ফ্যাটি অ্যাসিড যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। তাই হাঁসের মাংস নিয়মিত খেলে স্বাভাবিকভাবেই দ্রুত ওজন বাড়ে। তা ছাড়া শরীরের তাপমাত্রা উষ্ণ রাখতেও সাহায্য করে এই ফ্যাটি অ্যাসিড। এ ছাড়া হাঁসের মাংসে উচ্চখনিজ পদার্থ থাকায় গলাব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তবে যাদের উচ্চরক্ত চাপের সমস্যা আছে, তাদের হাঁসের মাংস না খাওয়াই ভালো। আর খেলেও অল্প পরিমাণে। কারণ এতে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে।

মুরগির মাংস

প্রোটিনে ভরপুরঃ
মুরগির মাংসে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে। যা পেশীকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখে। কম চর্বিযুক্ত প্রোটিন হওয়ায় এটি ওজন কমানোর ভালো উৎস। পেট ভরা রেখেও দীর্ঘদিন ওজন কমিয়ে রাখতে চাইলে মুরগির মাংস নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যকর খাবার।

বিষন্নতা দূর করেঃ
মুরগির মাংসে উচ্চ মাত্রায় ট্রাইফটোফ্যান নামক অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। ফলে এক বাটি চিকেন স্যুপ স্বস্তি এনে দিতে পারে। বিষন্নবোধ হলে কয়েকটি চিকেন উইংস খাওয়া যেতে পারে। যা মস্তিস্কে সেরেটোনিনের মাত্রা বাড়িয়ে চাপমুক্ত থাকতে সাহায্য করে।

হাড়ের ক্ষয় প্রতিরোধ করেঃ
বয়স্কদের আর্থ্রাইটিস ও হাড় সংক্রান্ত অন্য রোগের আশঙ্কা বেশি থাকে। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। প্রতিদিন মুরগির মাংস খাবার তালিকায় রাখলে এর প্রোটিন হাড়ের ক্ষয় প্রতিরোধ করবে।

হার্টের জন্য ভালোঃ
মুরগির মাংস হোমোকিস্টাইনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রেখে হার্টের বিভিন্ন ধরনের কার্ডিওভাস্কুলার রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে। হোমোকিস্টাইন একটি অ্যামিনো অ্যাসিড। উচ্চমাত্রায় এটি হার্টের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

ফসফরাসের প্রাচুর্যঃ
মুরগির মাংস ফসফরাস সমৃদ্ধ হওয়ায় দাঁত ও হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। এছাড়া ফসফরাস কিডনি, লিভার ও স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

হজমে সাহায্য করেঃ
মুরগির মাংসের ভিটামিন বি-৬ শরীরে বিপাকের মাত্রা উন্নত করে। শরীরে চর্বি না বাড়িয়েই খাবার হজম করতে পারে। রক্তনালী ঠিক রাখতেও এটি কাজ করে।

'নিয়াসিন' সমৃদ্ধঃ
শরীরকে ক্যান্সারমুক্ত রাখতে নিয়াসিন একটি প্রয়োজনীয় ভিটামিন। মুরগির মাংসে প্রচুর পরিমাণে নিয়াসিন থাকে, যা বিভিন্ন রকমের ক্যান্সার ও ত্রুটিপূর্ণ ডিএনএ দ্বারা যেসব জিনগত সমস্যা তৈরি হয় তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

চোখ ভালো রাখেঃ
অন্য খাবারগুলোর মতো মুরগির মাংসও চোখের সুরক্ষায় কাজ করে। মুরগির মাংসে রেটিনল, আলফা ও বিটা ক্যারোটিন, লাইকোপেন থাকে যার সবগুলোই ভিটামিন 'এ' তে পাওয়া যায়। চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এগুলো জরুরি উপাদান।

মাংসের পুষ্টি উপাদান/ ১০০ গ্রাম

পুষ্টি উপাদান	মাংসের ধরণ					
	গরুর মাংস	মহিষের মাংস	খাসির মাংস	ভেড়ার মাংস	হাঁসের মাংস	মুরগীর মাংস
শক্তি (কি:ক্যা:)	১০৩	৯৫	১১৮	১৯৬	১৩০	১০৬
পানি (গ্রাম)	৭৬	৭৮	৫৫.৮	৭২	৭২	৭১
আমিষ (গ্রাম)	২০	১৯	২১	১৯	২১	১৯
চর্বি (গ্রাম)	২.৩	১.৯	৩.৬	১৩.৬	৪.৮	১.৮
ভিটামিন-এ (মাইক্রো গ্রাম)	০	০	০	০	২৪	২৫
ভিটামিন-ডি (মাইক্রো গ্রাম)	০.৪	০.১	০	০.২	০.১	০.১
ভিটামিন-ই (মিলি গ্রাম)	০.২৩	০.০৫	০.১৮	০.৩১	০.০২	০.১২
থায়ামিন (মিলি গ্রাম)	০.০৬	০.০৪	০.১১	০.১৮	০.৩৬	০.১২
রিভোফ্লাবিন (মিলি গ্রাম)	০.১৯	০.২	০.৪৯	০.১৪	০.৪৫	০.০৭
নিয়াসিন (মিলি গ্রাম)	১০.০৩	৬	৩.৮	৪.১	৮.৮	১১.৪
ভিটামিন-বি৬ (মিলি গ্রাম)	০.৩২	০.৫৩	০.৪	০.১২৫	০.৩৪	০.৩১৫
ফোলেট (মাইক্রো গ্রাম)	৭	৮	৫	৬	২৫	৭
ক্যালসিয়াম (মিলি গ্রাম)	৪	১২	১২	১৩	৪	১৫
আয়রণ (মিলি গ্রাম)	২	১.৬	২.৮	২.২	২.৪	০.৫
ম্যাগনেসিয়াম (মিলি গ্রাম)	১৫	৩২	২৭	১৯	১৯	৩২
ফসফরাস (মিলি গ্রাম)	১৯০	১৮৯	১৯৩	১৫০	২৩৫	১৭৩
পটাসিয়াম (মিলি গ্রাম)	৩৯৫	২৯৭	৩৮৫	৩৮৫	২৭১	৩১৫
সোডিয়াম (মিলি গ্রাম)	৫২	৫৩	৮২	৮২	৭৪	৩৭
জিংক (মিলি গ্রাম)	৩.৫২	১.৯৩	৪	৪	১.৯	১.৭

সেশন-৫ঃ মানবদেহের পুষ্টি চাহিদা পূরণে মাছের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

- মাছ খাওয়ার উপকারীতা সম্পর্কে জানা
- বিভিন্ন ধরনের মাছের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জানা

উপকরণ

- ফেস্টুন
- ফেস্টুন

- গল্প বলা
- পদ্ধতি প্রদর্শন

মাছে ভাতে বাঙালি হিসাবে পরিচিত এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা, খাদ্যাভাস ও সংস্কৃতিতে মাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছারাও ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণে মাছ অন্যতম। মাছে আমিষের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন খনিজ পদার্থ ও উত্তম চর্বি বিদ্যমান। বর্তমানে আমাদের দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও দেশের জনসাধারনের অপুষ্টি দূরকরণ ও সুষম খাদ্যাভাস গড়ে তোলার জন্য জন প্রতি মাছ আহারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। একজন পাপ্তবয়স্ক বাংলাদেশী এখন বছরে গড়ে ১৯.৭১ কেজি মাছ আহার করে। যা আরও বাড়াতে হবে।

মাছে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানঃ

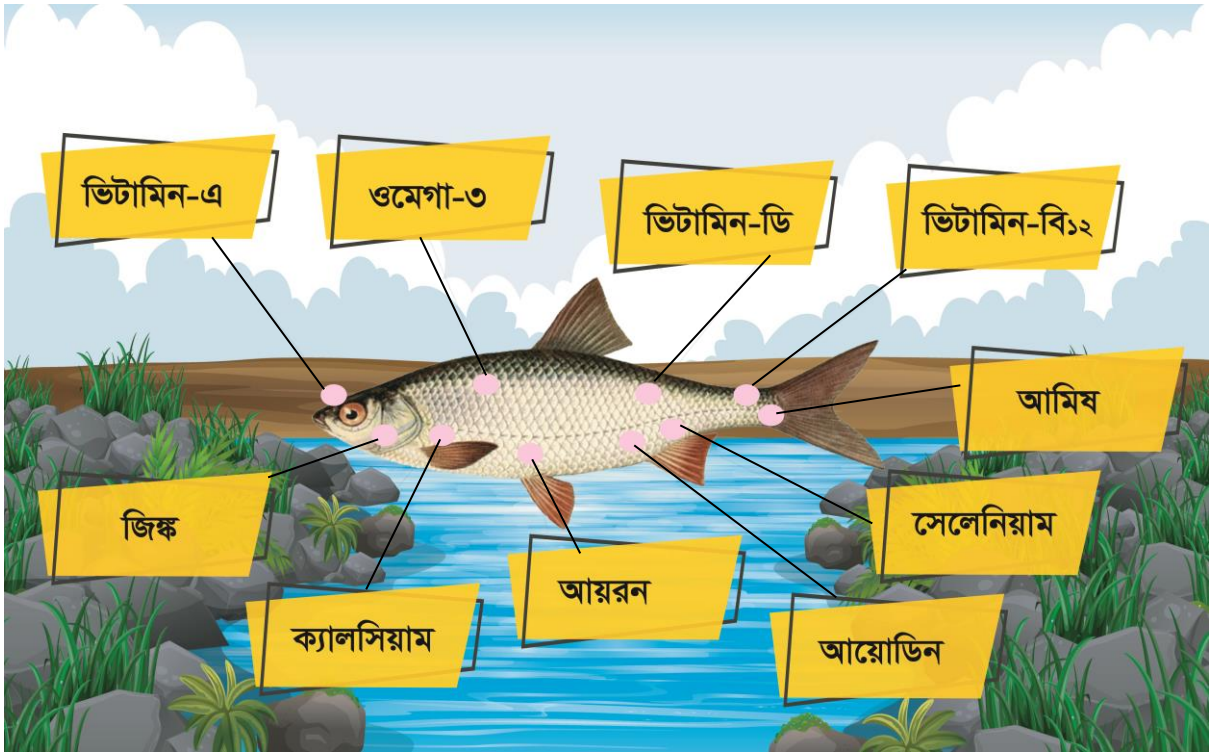

ছোট মাছ (মলা) ও বড় মাছের (রুই) পুষ্টি মানের পার্থক্যঃ

পুষ্টি উপাদান		মোলা মাছের তরকারি (৫০ গ্রাম পরিবেশন)	রুই মাছের তরকারি (৫০ গ্রাম পরিবেশন)
শক্তি		১১৬	১১০
আমিষ (গ্রাম)		৫	৫.৯
আয়রন	হিম আয়রন (মি:গ্রা:)	০.৮৩	০.১১
	নন-হিম আয়রন (মি:গ্রা:)	০.৫৮	০.২১
	আয়রন RDI (%)	১৪	৩
ভিটামিন-এ	৩,৪-ডিহাইড্রো রেটিনল আইসোমারস (মাইক্রোগ্রাম)	১০৫৭	-
	রেটিনল আইসোমারস (মাইক্রোগ্রাম)	১৯৬	-
	বিটাক্যারোটিন (গ্রাম)	২.৩	০.৫

সেশন-৬ঃ নারীর পুষ্টিগত যত্ন ও সেবা

উদ্দেশ্য

- প্রজন্মব্যাপী অপুষ্টির বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ
- গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মায়েদের পুষ্টিগত যত্ন ও সেবা সম্পর্কে জানতে পারবে

গল্প বলা

দলীয় আলোচনা

গর্ভবতী নারী এবং দুগ্ধদানকারী মায়েদের কেন বিশেষ পুষ্টিগত যত্ন ও সেবা প্রয়োজন তা আলোচনা করুন। প্রশ্ন করুন: গর্ভবতী নারী এবং দুগ্ধদানকারী মায়েদের কেন অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন? অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে আলোচনা করুন। অপুষ্টি চক্র ব্যাখ্যা করুন এবং এ বিষয়ে আলোচনা করুন।

প্রজন্মব্যপী অপুষ্টি চক্র

সঞ্চালক সকলকে অপুষ্টি চক্রের নিয়ে একটি পোস্টার দেখাবেন। তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করবেন যে এই পোস্টারটি থেকে তাঁরা কী বুঝতে পারছেন।

- সঞ্চালক এবার প্রজন্মব্যাপী অপুষ্টির বিষয়টি পোস্টার দেখিয়ে বলবেন এবং উপস্থিত সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন। এইভাবে বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনা তৈরী করা হবে যাতে করে সন্তান ধারণের বয়স হওয়ার অনেক আগে থেকেই মেয়েদের মধ্যে রক্তাল্পতা বা অপুষ্টির সমস্যা দূর করা যায়।
- অপুষ্টির চক্রটি বিনষ্ট করার জন্য এটিকে প্রথমে সনাক্ত করা দরকার। অংশগ্রহণকারীদের অপুষ্টির নানা কারণকে সনাক্ত করতে বলুন।
- সবাইকে জিজ্ঞেস করুন যে এই চক্রটি সত্যিই বিনষ্ট করা যাবে কিনা।

সহায়কের জন্য তথ্যঃ

শিশুকে সঠিকভাবে খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান না করলে তার শারীরিক বৃদ্ধি বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে সে খর্বকৃতি (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা কম) ও অপুষ্ট কিশোর/ কিশোরী হিসাবে বেড়ে উঠে। আর একজন অপুষ্ট কিশোরী যখন গর্ভধারণ করে তখন স্বাভাবিকভাবেই কম ওজনের শিশুর জন্ম দেয় আর ঝুঁকি বেড়ে যায়। সেই কম ওজনের শিশুটি যদি মেয়ে হয় এবং তাকেও সঠিকভাবে খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা না দেয়া হয় তাহলে সেও অপুষ্টিতে ভুগবে এবং বড় হয়ে বিয়ের পর অপুষ্ট শিশু জন্ম দেবে। এভাবে অপুষ্টির চক্র বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে যার পরিণতি ভয়াবহ। এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, অপুষ্টি একটি বড় ধরনের স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক সমস্যা যা প্রতিরোধযোগ্য এবং চিকিৎসাযোগ্য।

২. দলগত কাজঃ

অংশগ্রহণকারীদেরকে ০২টি দলে ভাগ হয়ে একটি দলকে গর্ভবতী নারীর পুষ্টিগত যত্ন ও সেবা এবং অন্য একটি দলকে দুগ্ধদানকারী মায়েদের পুষ্টিগত যত্ন ও সেবাপূরণে করণীয় বিষয়ের উপর দলীয়ভাবে আলোচনা করতে বলুন। এর জন্য প্রতিটি দলকে ১০ মিনিট সময় দিন এবং সময় শেষে দলের প্রত্যেক সদস্যকে তাদের দলীয় আলোচনার বিষয়বস্তু থেকে একটি করে যত্ন ও সেবা বলার জন্য অনুরোধ করুন।

সহায়কের জন্য তথ্যঃ

গর্ভবতী নারীর পুষ্টিগত যত্ন ও সেবাঃ

- ✓ গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন ৩ বেলা খাবারের সাথে নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার বেশি করে খেতে হবে;
- ✓ মাছ, মাংস, ডিম , দুধ, কলিজা, ঘন ডাল, গাঢ় রঙের শাক-সবজি ও মৌসুমী দেশী ফল খেতে হবে;
- ✓ রান্নায় পরিমিত পরিমাণ তেল ব্যবহার করতে হবে;
- ✓ গর্ভাবস্থায় ভিটামিন-সি যুক্ত খাবার খেতে হবে;
- ✓ গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন ডিম ও দুধ খেতে হবে;
- ✓ আয়রন ও ফলিক এসিড সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে;
- ✓ সকালে ঘুম থেকে উঠে দ্রুত নাস্তা করতে হবে;
- ✓ গর্ভাবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম (দিনে কমপক্ষে ২ ঘন্টা) নিতে হবে;
- ✓ গর্ভবতী মহিলাকে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তিতে রাখতে হবে, এতে গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি স্বাভাবিক হবে।
- ✓ ভারী কাজ (যেমন: টিউবওয়েল চাপা, ধান ভানা, ভারী জিনিস তোলা, অতিরিক্ত/ ভারী কাপড় ধোয়া) থেকে বিরত থাকতে হবে এবং কষ্টকর পরিশ্রমের কাজ বর্জন করতে হবে;
- ✓ আয়োডিন যুক্ত লবণ খেতে হবে;
- ✓ পরিবারের সকলকে গর্ভ, প্রসব এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে নারীর ৫টি বিপদ চিহ্ন-{যোনী পথে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ, প্রচন্ড জ্বর, তীব্র মাথা ব্যথা এবং চোখে ঝাপসা দেখা, শরীরে খিঁচুনি, অনেকক্ষণ ধরে প্রসববেদনা/ বিলম্বিত প্রসব (১২ ঘন্টার অধিক সময় ধরে থাকলে)} সম্পর্কে অবগত ও সচেতন করতে হবে; এবং
- ✓ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

সহায়কের জন্য তথ্যঃ

দুগ্ধদানকারী নারীর পুষ্টিগত যত্ন ও সেবাঃ

- ✓ প্রত্যেক বার খাবারের সময় প্রসূতি মাকে স্বাভাবিকের তুলনায় কমপক্ষে ২ মুঠ বেশি পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। অতিরিক্ত খাবার শিশুর জন্য মায়ের দুধ তৈরী করতে সহায়তা করে এবং মায়ের নিজের শরীরের ঘাটতি পূরণ করে;
- ✓ দুগ্ধদানকারী মায়ের কাজে পরিবারের সকল সদস্যদের সহযোগিতা করতে হবে;
- ✓ দুগ্ধদানকারী মাকে সব ধরনের পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে যেমন: ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, ডাল এবং সবুজ, হলুদ ও কমলা রঙের শাক-সবজি ও ফলমূল ইত্যাদি;
- ✓ ঢিলে-ঢালা ও আরামদায়ক পোশাক পরিধান করতে হবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে; এবং
- ✓ বাচ্চা হবার পর অন্তত চার বার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে

৩. গুরুত্বপূর্ণঃ

- ✓ গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মায়েদের অতিরিক্ত পরিশ্রম না করা এবং যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে উৎসাহিত করা;
- ✓ গর্ভবতী নারী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের বাড়তি যত্ন এবং তাদের কাজে সহযোগিতা করার জন্য স্বামী এবং শ্বাশুড়ীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে;এবং
- ✓ ঘন ঘন যাতে গর্ভবতী না হয় সে জন্য নারীদের উচিত পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে যাওয়া এবং জন্ম নিয়ন্ত্রনে পুরুষের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।

গর্ভবতী মহিলাদেরকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

গর্ভবতী নারীর খাদ্য তালিকাঃ (প্রতিদিন)

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	পরিমাণ (রান্না করা, বাটির পরিমাপ ২৫০ এমএল)
১.	রুটি/ ব্রেড	৩টি (মাঝারি)
২.	ডিম	১টি
৩.	সবজি (শিম, কুমড়া)	২.৫ বাটি (আড়াই বাটি)
৪.	ফল (আমড়া, কমলা, পেয়ারা ইত্যাদি)	১টি (মাঝারি)
৫.	দুধের তৈরি খাবার	১ বাটি
৬.	ভাত	৫ বাটি
৭.	ডাল	২ বাটি (ঘন)
৮.	শাক (লাল শাক, মিষ্টি আলুর শাক)	১/২ বাটি
৯.	মাছ/ মাংস	২-৩ টুকরা
১০.	বিস্কুট	২টি
১১.	কলা/ আম (পাঁকা)	১টি (মাঝারি)
১২.	দুধ	১ গ্লাস
১৩.	খাবার তেল	৫ চা চামচ

তথ্যসূত্র: ফুড কম্পোজিশন টেবিল এ্যান্ড ডাটাবেইজ ফর বাংলাদেশ উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টুসিলেক্টেডএথনিক ফুডস, আইএনএফএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দুগ্ধদানকারী নারীর পুষ্টিগত যত্ন ও সেবাঃ

বুকের দুধদানকারী নারীর খাবারের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	পরিমাণ (রান্না করা, বাটির পরিমাপ ২৫০ এমএল)
১.	রুটি/ ব্রেড	৩টি (মাঝারি)
২.	ডিম	১টি
৩.	সবজি (শিম, কুমড়া)	২.৫ বাটি (আড়াই বাটি)
৪.	ফল (আমড়া, কমলা, পেয়ারা ইত্যাদি)	১টি (মাঝারি)
৫.	দুধের তৈরি খাবার ইত্যাদি	১ বাটি
৬.	ভাত	৬ বাটি
৭.	ডাল	৩ বাটি (হালকা ঘন)
৮.	শাক (লাল শাক, মিষ্টি আলুর শাক)	১/২ বাটি
৯.	মাছ/ মাংস	২-৩ টুকরা
১০.	বিস্কুট	২টি
১১.	কলা/ আম (পাঁকা)	১টি (মাঝারি)
১২.	দুধ	১ গ্লাস
১৩.	খাবার তেল	৫ চা চামচ

তথ্যসূত্র: ফুড কম্পোজিশন টেবিল এ্যান্ড ডাটাবেইজ ফর বাংলাদেশ উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টুসিলেক্টেড এথনিক ফুডস, আইএনএফএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেশন-৪ঃ শিশুর অপুষ্টির কারণ ও অপুষ্টি রোধ করার উপায়

উদ্দেশ্য

- শিশুর অপুষ্টির অন্তর্নিহিত কারণগুলিকে চিহ্নিত করা এবং এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করার উপায় খোঁজা
- ১০০০ দিনের পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে জানা

উপকরণ

- ফুড কার্ড
- ছবি

- গল্প বলা
- পদ্ধতি প্রদর্শন

সঞ্চালক ছবির কার্ড ব্যবহার করে নিচের গল্পটি বলবেন যাতে সদস্যরা শিশুর অপুষ্টির কারণগুলি বুঝতে পারেন। এবার একজন সদস্য ছবির কার্ডগুলি ব্যবহার করে গল্পটি আবার বলবেন। কার্ডগুলি মাটিতে রাখা থাকবে।

উদাহরণ- একটি অপুষ্টির গল্প

বামাই খুব অল্প বয়েসেই বিয়ে করলো একটি গরীব পরিবারে এবং খুব শিগগিরই সে গর্ভবতী হয়ে পড়ল। গর্ভাবস্থায় সে একেবারেই খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর দেয়নি, ফলে সে দুর্বল হয়ে পড়ল এবং রক্তাল্পতায় ভুগতে শুরু করলো। সে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে থেকে আয়রন ট্যাবলেট নিয়ে খায় নি, কারণ সে একবার যখন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়েছিল, তখন তাকে বলা হয় যে ট্যাবলেট ফুরিয়ে গেছে। সে একটি স্বাভাবিকের থেকে কম ওজনের বাচ্চার জন্ম দেয়। সে নিজেও অপুষ্ট ছিল এবং যেহেতু তার শাশুড়ি তাকে দিনে একবারই খেতে দিতেন, তার বাচ্চাকে দেবার মত যথেষ্ট দুধও হয় নি। তার শাশুড়ি তাকে প্রথম ঘন হলদেটে দুধ বাচ্চাকে দিতে বারণ করেন এবং দুদিন ছাগলের দুধ খাওয়াতে বলেন।

এর পর থেকে বাচ্চাটিকে বোতলের দুধ দেওয়া হয়। বামাই যখন বাচ্চাটিকে টীকা দিতে নিয়ে যায় তখন স্বাস্থ্য কর্মী একটি মিটিং এ যাচ্ছিলেন, তাই তাকে আরেকদিন আসতে বলা হয়। এর পর সে আর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যায় নি। বাচ্চার যখন ১০ মাস বয়স তখন তার খুব জ্বর হয় এবং সারা গায়ে গোটা বেরোয়। এই সময়তেও তাকে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয় নি। ঔষুধ দেওয়াতে বাচ্চাটি ভালো হয়ে ওঠে, কিন্তু সব মিলিয়ে সে খুবই দুর্বল ও অসুস্থ ছিল; তার হাত পা সরু সরু ছিল এবং দেখে মনে হতো গা থেকে চামড়া ঝুলে আছে। সে বড় হয়ে একটি খাটো এবং অপুষ্ট বাচ্চা হয়।

এবার সঞ্চালক প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের অপুষ্টির কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করবেন।

- সঞ্চালক এবার বলবেন যে "চেইন খেলা"র মাধ্যমে শিশুকালীন অপুষ্টির বিভিন্ন সমাধানগুলি বোঝা হবে। এটি একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য হাতে কলমে খেলা যার মধ্যে অপুষ্টির কারণগুলি বোঝা যাবে এবং চেনা উপায়ে সমাধান করা যাবে
- সমস্ত কারণগুলি চারটি ভাগে ভাগ করা যাবে
  (ক) পুষ্টি (সবুজ রং)- খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত
  (খ) সামাজিক সংস্কার (হলুদ রং)- সামাজিক আচার, কুসংস্কার, মনোভাব ও ব্যবহার সংক্রান্ত
  (গ) অসুস্থতা (লাল রং)-নানা জীবাণু যেমন: ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, পরজীবী ইত্যাদি
  (ঘ) অধিকার (নীল রং)- যেখানে সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে
- সঞ্চালক চারটি রঙের রিবন (ফিতা) দিয়ে এই চারটি ভাগ বোঝাবেন এবং প্রত্যেকটি রং কী অর্থ বহন করছে তা বলবেন
- এর আগে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে অপুষ্টির যে যে কারণের তালিকা করেছেন, সঞ্চালক সেগুলি মনে করিয়ে দিয়ে জানাবেন যে সব কারণগুলিই এই চারটি ভাগের অন্তর্গত
- এই খেলাটির জন্য সঞ্চালক একটি পুতুল বাচ্চা ব্যবহার করবেন। প্রথমে এটিকে একটি উঁচু জায়গায়, যেমন দেওয়ালের ওপরে বা গাছের ডালে রাখবেন
- রিবনগুলি বা ফিতা সকলকে দেওয়া হবে এবং সঞ্চালক প্রত্যেকবার একটি করে অপুষ্টির কারণ বলার পর, সেই কারণটি যে ভাগের অন্তর্গত, সেই রঙের রিবন নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা পুতুলের পায়ে বেঁধে দেবেন। যাঁর কাছে ঠিক রঙের রিবন বা ফিতা আছে, তিনি অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে পুতুলের পায়ে রিবনটিবা ফিতাটি বাঁধবেন। প্রত্যেকটি এক রঙের রিবন আগেরটির সঙ্গে চেইন বা শিকলের মত করে জুড়ে দেওয়া হবে।
- চেইনটি ক্রমশঃ লম্বা হতে থাকবে এবং এর থেকে বোঝা যাবে যে কিভাবে একটি শিশু অপুষ্টির নানা কারণের শিকলে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং ক্রমশঃ অপুষ্ট হয়
- প্রশিক্ষণার্থীরা এর পর নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করবেন
- কখনো কখনো অপুষ্টির একটি কারণ বিভিন্ন ভাগের মধ্যে পড়তে পারে, যেমন তা সামাজিক এবং খাদ্য সংক্রান্ত দুই-ই হতে পারে। সেক্ষেত্রে সদস্যরা আলোচনা করবেন এবং সঞ্চালক তাঁদের সাহায্য করবেন

সম্ভাব্য সমাধান চিহ্নিত করাঃ সঞ্চালক এইবার জিজ্ঞেস করবেন যে এই শিকলটি ভেঙে ফেলতে হলে কী করা প্রয়োজন। আগের মিটিং এ আলোচনা করা বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন সঞ্চালক। সদস্যরা নানা উপায় ভাববেন এবং খোলাখুলি আলোচনা করবেন। সমাধান পাওয়া গেলে একটি একটি করে রিবন বা ফিতা খুলে নেওয়া হবে। সঞ্চালক সব সমাধানগুলির নোট রাখবেন।

এবার সঞ্চালক প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শিশুর অপুষ্টি রোধে করণীয় বিষয়গুলো আলোচনা করবেন।

শিশুর পুষ্টি

- শিশুর জন্মের পরপরই (১ ঘন্টার মধ্যে) শিশুকে শালদুধ খাওয়ানো বিশেষ প্রয়োজন।
- মায়ের দুধ শিশুর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- শিশুকে ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ দিতে হবে এমনকি এক ফোঁটা পানিও না।

শালদুধ

শিশু জন্মের পর প্রথম ৩-৫ দিনের মধ্যে মায়ের স্তন থেকে হলুদ রঙের ঘন আঠালো যে দুধ বের হয় তাকে শালদুধ বলে। শালদুধে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ এবং অন্যান্য ভিটামিন থাকে যা শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

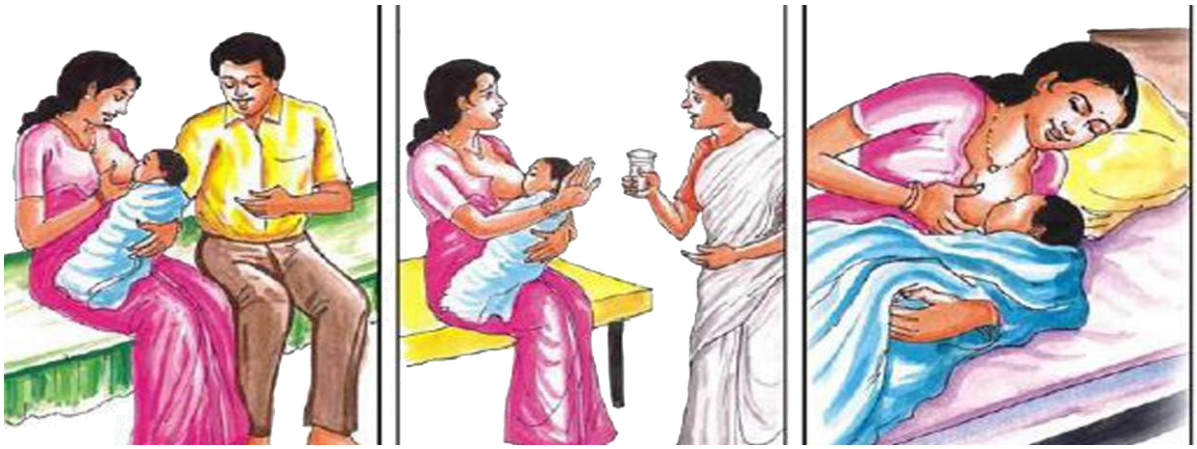

মায়ের দুধের উপকারিতা

মায়ের দুধের উপকারিতা অনেক। সেগুলো হচ্ছে–

শিশুর উপকারিতা-

- ✓ শাল দুধ শিশুর জন্য অত্যন্ত পুষ্টিকর
- ✓ মায়ের দুধে এন্টিবডি থাকে যা শাল দুধে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এই এন্টিবডি শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শিশুর অসুখ কম হয় যেমন- জন্ডিস, ডায়রিয়া, কান পাকা, সর্দি-কাশি, চুলকানি, নিউমোনিয়া, সেপসিস ইত্যাদি হবার সম্ভাবনা কমে যায়, এছাড়াও এতে প্রচুর ভিটামিন-এ থাকে
- ✓ পরিমাণে কম হলেও এই শাল দুধ প্রথম তিন দিনের জন্য যথেষ্ট
- ✓ জন্মের পর পরই শিশুকে মায়ের বুকে দিলে সে দুধ চুষে খেতে শিখে এবং এতে মায়ের দুধও তাড়াতাড়ি তৈরী হয়
- ✓ শাল দুধ শিশুর প্রথম কালো পায়খানা বের হতে সাহায্য করে
- ✓ শিশুর শরীরে যতটুকু পানির দরকার তা মায়ের দুধে বিদ্যমান
- ✓ শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ালে মা ও শিশুর বন্ধন দৃঢ় হয়

- ✓ মায়ের দুধ সবসময়ই নিরাপদ। এটি বাসি হওয়া এবং সংক্রামিত হবার কোন সম্ভাবনা নাই। সবসময় সঠিক তাপমাত্রায় থাকে এবং এই দুধ তৈরীর ঝামেলা নাই
- ✓ মায়ের দুধ শিশুর চোয়াল ,দাঁত ও মাড়ি গঠনে সহায়তা করে
- ✓ মায়ের দুধ দেয়ার সময় মায়ের শরীরের সাথে লেগে থাকার কারণে শিশু মায়ের উষ্ণতা পায়, যা শিশুর জন্য খুব প্রয়োজন
- ✓ শিশুর অসুস্থতার সময় দিনে-রাতে ঘন ঘন মায়ের দুধ দিলে শিশু তাড়াতাড়ি অসুখ থেকে সেরে উঠে এবং অপুষ্টি থেকে রক্ষা পায়

মায়ের উপকারিতা

জন্মের পর পরই শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ালে:-

- ✓ মায়ের জরায়ু দ্রুত সংকুচিত হয় এবং তাড়াতাড়ি আগের অবস্থায় ফিরে যায়
- ✓ গর্ভফুল তাড়াতাড়ি বের হয় এবং রক্তপাত কম হয় (সেজন্য সিজারিয়ান সেকশনের পরও শিশুকে দুধ দেয়ার জন্য মাকে সাহায্য করতে হবে)
- ✓ মায়ের দুধ বেশী বেশী করে তৈরী হয়
- ✓ মা মানসিক তৃপ্তি পান

পরিবারের উপকারিতা

- ✓ কৃত্রিম দুধ, দুধ তৈরির সরঞ্জামাদি ক্রয় এবং জ্বালানি-পানির খরচ বেঁচে যায়
- ✓ শিশু কম অসুস্থ হয় তাই তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার সময় ও খরচ বাঁচে
- ✓ পরিবারের অর্থ সাশ্রয় হবে এবং সর্বোপরি মায়ের তথা পরিবারের দুশ্চিন্তা কমে

শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো

জন্ম থেকে পূর্ণ ৬ মাস (১৮০ দিন) পর্যন্ত কোন শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ দেয়া, বাইরের কোন খাবার বা এমন কি এক ফোঁটা পানিও না দেয়া, শিশুর পুষ্টি রক্ষার জন্য এসময় শুধুমাত্র মায়ের দুধই যথেষ্ট।

বাড়তি খাবার

শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হবার পর মায়ের দুধের পাশাপাশি তাকে যে খাবার খাওয়ানো হয় তাকে ‘বাড়তি খাবার’ বলে। শিশুর ৬ মাস বয়সের পর থেকে তার সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য শুধু মাত্র মায়ের দুধই যথেষ্ট নয় কাজেই তখন মায়ের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার দেয়া প্রয়োজন। তাই ৬ মাস পূর্ণ হওয়ার পর থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি প্রতিদিন শিশুর বয়স অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে পুষ্টিকর বাড়তি খাবার খাওয়ানো শুরু করতে হবে।

সঠিক সময়ে বাড়তি খাবার শুরু করার গুরুত্ব

- ✓ ৬ মাস (পূর্ণ) হওয়ার আগে শিশুকে বাড়তি খাবার দিলে শিশু মায়ের দুধ খাওয়া কমিয়ে দেয় ফলে সে সঠিক পুষ্টি পায় না, সেজন্য ৬ মাসের পর থেকে বাড়তি খাবার শুরু করতে হয়
- ✓ শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির সাথে সাথে যতটুকু শক্তি/পুষ্টির প্রয়োজন হয় তা শুধুমাত্র মায়ের দুধে পাওয়া যায়। তবে ৬ মাসের পর থেকে মায়ের দুধ শিশুর জন্য যথেষ্ট নয় সেজন্য তাকে ৬ মাসের পর থেকে বাড়তি খাবার শুরু করতে হয়
- ✓ ৬ মাস (পূর্ণ) হলে শিশু বাড়তি খাবার সহজে খেতে, চিবাতে ও গিলতে শিখে এবং খাবার হজম করতে পারে। সেজন্য বাড়তি খাবার শুরু করার এটাই সঠিক বয়স
- ✓ ৬ মাস (পূর্ণ) হওয়ার সাথে সাথে বাড়তি খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস না করলে পরে শিশু খেতে শিখবে না, তার সঠিক চাহিদা পূরণ হবে না ফলে সে অপুষ্টিতে ভুগবে

বাড়তি খাবারের উপকারিতা

- মায়ের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার দেয়া শুরু করলে শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত হয়
- শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি দ্রুত হয় এবং বুদ্ধি ভাল হয়
- সঠিক বাড়তি খাবার খেলে শিশুর অসুখ কম হয় এবং সাধারণ অসুখ থেকে তাড়াতাড়ি সেরে উঠে

সুপারিশ সমূহ নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল

১. বিভিন্ন ধরণের খাবার: বিভিন্ন ধরণের পারিবারিক খাবার থেকে শিশুর জন্য বাড়তি খাবার তৈরি করতে হবে।

- ✓ বিভিন্ন খাবারের তালিকা থেকে কমপক্ষে ৪টি ভিন্ন ধরণের খাবার নিয়ে শিশুর জন্য প্রতিদিনের খাবার তৈরি করতে হবে এবং এর ভিতর দিনে অন্ততপক্ষে ১টি প্রাণীজ খাবার থাকতে হবে
- ✓ বিভিন্ন ধরণের মিশ্রিত খাবার শিশুর পূর্ণ পুষ্টি নিশ্চিত করবে, কারণ বিভিন্ন ধরণের খাবারে বিভিন্ন ধরণের পুষ্টি থাকে
- ✓ বিভিন্ন ধরণের খাবার না খাওয়ালে শিশু মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে ঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় যার কারণে শিশু সব সময় অসুখ-বিসুখে ভোগে
- ✓ বিভিন্ন ধরণের খাবার খাওয়ালে একটি শিশুর ৬-২৪ মাস বয়সের সময়ে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে বেড়ে উঠে এবং তার বুদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে
- ✓ শিশুর খাবারে তেল বা ঘি দেয়া ভাল, এতে শক্তির পরিমাণ বেশী থাকে
- ✓ চিনির পরিবর্তে গুড় ব্যবহার করা ভালো, কারণ গুড় আয়রনের ভালো উৎস
- ✓ শিশুদের দেশীয় ও মৌসুমি ফলমূল খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে
- ✓ আয়রন ও ভিটামিন 'এ' ঘাটতি পূরণের জন্য মা ও শিশুকে ভিটামিন 'এ' ও আয়রন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে

২. **খাবারের পরিমাণঃ ছয় মাসের পর থেকে শিশু খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। তাই তার খাবারের পরিমাণও সেভাবে বাড়াতে হবে।**

- ✓ এসময় তার যথাযথ চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো হলে সে সঠিকভাবে বেড়ে উঠে
- ✓ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে এবং বুদ্ধি বাড়ে
- ✓ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে
- ✓ বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর খাবারের পরিমাণ না বাড়ালে:
- ✓ শারিরীক ও মানসিক দিক থেকে সে সঠিকভাবে বেড়ে উঠবেনা, মেধার বিকাশ হবে না, সব সময় অসুখে ভুগবে
- ✓ বড় হয়ে লেখা-পড়ায় ভালো করতে পারেনা, এক সময় স্কুল থেকে ঝরে পড়বে

৩. **খাবারের ঘনত্বঃ শিশু বড় হয়ে উঠার সাথে সাথে তার চাহিদা অনুযায়ী খাবারের ঘনত্ব বাড়াতে হবে।**

- ✓ বাড়তি খাবারে ঘনত্ব যত বেশি সঠিক হয় তার পুষ্টিমানও তত বেশি হয়। মাখানো খাবারটি এমন হবে যেন তা চামচ/হাত দিয়ে তুললে সহজে পড়ে না যায়
- ✓ তরল খাবারের চেয়ে ঘন খাবারে বেশি পরিমাণে শক্তি, আমিষ ও অন্যান্য পুষ্টি থাকে, যা শিশুকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে
- ✓ শিশুর পেট ছোট হওয়ার কারণে তারা বেশি পরিমাণে খাবার খেতে পারে না, (সে জন্য খাবার বেশি পাতলা যেমন: পাতলা ডাল, জুস, সুজি বা অন্য কোন তরল হলে শিশুর পেট ভরে যায়, সে আর খেতে চায় না) তাই খাবার ঘন হলে অল্প পরিমাণে খাবারেই শিশু যথেষ্ট পুষ্টি পায়
- ✓ খাবারের ঘনত্ব সঠিক না হলে খাবারের পুষ্টিমান কম হয় যা শিশুর বেড়ে উঠাকে বাধাগ্রস্থ করে

স্বর্ণময় ১০০০ দিন

একটি শিশুর মাতৃগর্ভে ১ম দিন হতে তার ২য় জন্মদিন পর্যন্ত সময়কে বলা হয় স্বর্ণময় ১০০০ দিন। গর্ভবতী মায়েদের জন্য ১ম ১০০০০ দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একটি নবজাত শিশুর কার্যক্ষমতা, বেড়ে ওঠা, শিক্ষা এবং অন্যান্য সকল গুণে সমৃদ্ধ হওয়ার সবকিছুই নির্ভর করে এই ১০০০ দিনে গর্ভবতী মা ও নবজাত শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও যত্নের উপর। কারণ, এসময়ই শিশুর মস্তিস্ক তৈরি ও বিকাশ ঘটে যা তার সারাজীবনের স্বাস্থ্যের ভিত্তি। গর্ভকালীন সময়ে মায়ের পরিপূর্ণ পুষ্টি, জন্মের পর ৬ মাস পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো এবং ৬ মাস পর হতে সঠিক সম্পূরক খাবার খাওয়ানো এসব মিলেই একটি শিশুর মানসিক ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

প্রথম ১০০০ দিনে গভবতী মা ও শিশুর জন্য মূল পুষ্টি উপাদানসমূহঃ

ভিটামিন-এঃ

কাজ:

দৃষ্টি শক্তি বজায় রাখে

কোষের বৃদ্ধি ও আলাদা করতে সাহায্য করে

হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, কিডনী ও অন্যান্য অঙ্গের স্বাভাবিক গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করে

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে

অভাবজনিত সমস্যাঃ

দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হতে পারে

শিশুর বৃদ্ধি কম হতে পারে

শিশুর খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমতে পারে

সহজেই বিভিন্ন ধরণের সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়তে পারে

সময়ঃ গভকালীন, শিশু, প্রাক-শৈশব

খাদ্য উৎসঃ ডিমের কুসুম, হলুদ ও গাঢ় সবুজ শাক-সবজি, মিষ্টি কুমড়া, পাকা আম, মিষ্টি আলু, ব্রোকলি, কলিজা, গাজর ইত্যাদি

ভিটামিন-বি৬ঃ

কাজঃ

মস্তিস্কের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কাযক্ষমতার জন্য অপরিহায

মস্তিস্কের নিউরোট্রান্সমিটারের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে

এক স্নায়ু কোষ হতে অন্য স্নায়ু কোষে সংকেত পাঠাতে যে রাসায়নিক পদাথের প্রয়োজন তা সরবরাহ করে

সেরোটনিন এবং নরপিনেফরিন হরমোন তৈরিতে সাহায্য করে

অভাবজনিত সমস্যাঃ

পেশী দূবলতা

বিরক্তি

বিষন্নতা

অমনোযগী

সময়ঃ গভকালীন, শিশু, প্রাক-শৈশব

খাদ্য উৎসঃ মাংস, কলিজা, আলু, কলা, স্টাস জাতীয় সবজি ইত্যাদি

ভিটামিন-বি১২ ঃ

কাজঃ

কোষের স্বাস্থ্য ঠিক রাখে

DNA তৈরিতে সাহায্য করে

সকল কোষে জেনেটিক পদাথসমূহ সরবরাহ করে

ফলিক অ্যাসিডের সাথে মিলিত হয়ে লোহিত রক্ত কণিকা তৈরি করে এবং শরীরে আয়রণের কাযক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়

অভাবজনিত সমস্যাঃ

জন্মগত ত্রুটির ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। যেমন: ব্রেনের নিউরার টিউবের ত্রুটি

নিধারিত সময়ের পূবে বাচ্চা প্রসবে ভূমিকা রাখে

সময়ঃ গভকালীন, শিশু

খাদ্য উৎসঃ মাংস, মাছ, পোল্ট্রি, ডিম, দুধ ও পনির

ক্যালসিয়ামঃ

কাজঃ

হাঁড়ের গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে

দাঁতের গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে

সুস্থ্য স্নায়ু ও পেশী কোষের রক্ষণাবেক্ষনে সাহায্য করে

অভাবজনিত সমস্যাঃ

রিকেটস হওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে পারে

হাঁড়ের সংযোগস্থলের বৃদ্ধি কমে যেতে পারে এবং ফুলে যেতে পারে

হাঁড়ের ভঙ্গুরতার ঝুঁকি বাড়তে পারে।

সময়ঃ গভকালীন, শিশু

খাদ্য উৎসঃ দুধ, পনির, দই এবং অন্যান্য দুগ্ধজাতীয় খাবার, ছোট মাছ ইত্যাদি

সেশন-৮ঃ কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি

উদ্দেশ্য

- কিশোর-কিশোরীদের দৈহিক পরিবর্তন সম্পর্কে জানা
- কিশোর-কিশোরীদের সুষম পুষ্টি সম্পর্কে জানা

- গল্প বলা
- দলীয় আলোচনা

কৈশোরকাল

শৈশবকাল থেকে যৌবনে পদার্পনের মধ্যবর্তী সময় (১০-১৯ বছর)-কে কৈশোরকাল বলা হয় এবং এই বয়সের ছেলে-মেয়েদেরকে কিশোর-কিশোরী বলা হয়। কৈশোরকাল জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এ সময় তাদের বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে, তাই এ সময় তাদের পুষ্টি চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। দেহের সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে তাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ পরিচর্যা করা প্রয়োজন। একই সাথে তাদেরকে খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলাও একান্ত জরুরী।

কৈশোরকাল এর প্রকারভেদঃ

১. প্রাক কৈশোরকাল: ১০-১৩ বছর
২. মাঝারি কৈশোরকাল: ১৪-১৬ বছর
৩. বিলম্বিত কৈশোরকাল: ১৭-১৯ বছর

কৈশোরকালে পুষ্টির গুরুত্বঃ

কৈশোরকাল শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির মএকটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে দেহের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। কৈশোরকালে মোট উচ্চতার১০-২০% এবং মোট ওজনের ২৫-৫০% ওজন বৃদ্ধি হয়। এজন্য এই সময়ে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে যায়। এই বৃদ্ধির সাথে মানবিকবোধ, আবেগানুভূতি ও হরমোন জনিত পরিবর্তনও জড়িত। মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি দ্রুত হয় ১০-১৩ বছর বয়সের মধ্যে আর ছেলেদের ক্ষেত্রে তা হয় ১২-১৫ বছর বয়সের মধ্যে। কৈশোরকালের এই বৃদ্ধিই পরবর্তীকালে শারীরিক আকার-আকৃতি, কর্মক্ষমতা, সন্তান জন্মদানে সহজ সাধ্যতাকে নির্ধারণ করে। এছাড়াও গভর্কালীন, প্রসবকালীন ঝুঁকি ও কম ওজনের শিশু জন্মদানের সম্ভাবনা কমানোর ক্ষেত্রেও কিশোরীর পুষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কৈশোরকাল: উচ্চতা, ওজন ও দৈহিক গঠনের পরিবর্তন

উচ্চতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন

- মোট উচ্চতার ১৫-২০% এই সময়ে হয়
- মেয়েদের চাইতে ছেলেদের দৈহিক বৃদ্ধি দেরীতে শুরু হয়

ওজনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন

- মোট ওজনের ২৫-৫০% এই সময়ে হয়

দৈহিক গঠন ও কাঠামোর ক্ষেত্রে পরিবর্তন

- প্রায় ৪৫% শরীরের কাঠামোর (মাংশপেশী) অংশ বিশেষ এই সময়ে যোগ হয়
- জন্ম থেকে কৈশোরকালের মধ্যে, শরীরের হাড়ের গঠনের ৯০ ভাগ সম্পন্ন হয়
- মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা এই সময় তুলনা মূলক ভাবে বেশী মাংশ পেশী লাভ করে

অপর্যাপ্ত পুষ্টির কারণে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। যেমন:

- ✓ আয়রনের অভাবে কৈশোরকালীন শারীরিক বৃদ্ধি বিলম্বিত হতে পারে। বিশেষ করে কিশোরীদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মাসিক ঋতুস্রাবের কারণে শরীরে আয়রনের চাহিদা বেড়ে যায়
- ✓ আয়রন ঘাটতির কারণে শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, স্বাভাবিক জ্ঞান বৃদ্ধির বিকাশ কমে যায় এবং পড়ালেখার প্রতি মনোযোগ অনেকাংশে কমে যায় ফলে স্কুলে যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে
- ✓ কিশোরী অবস্থায় গর্ভধারণ, (বিশেষ করে মা যদি অপুষ্টিতে ভোগেন ও বেঁটে হন) মা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়
- ✓ অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম, মানসিক ও শারীরিক চাপের কারণে কৈশোরকালে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। পরিবারের মধ্যে খাবার বিতরণ ও খাবার গ্রহণে ছেলে-মেয়ের মধ্যে প্রথাগতআচরণের কারণে অনেক দেশে শৈশব থেকে শুরু করে কৈশোরকাল পর্যন্ত মেয়েরা বিশেষভাবে অপুষ্টির শিকার হয়ে থাকে।

কৈশোরকালীর ঝুকিঃ

গর্ভাবস্থার সময়ঃ

- ✓ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে গর্ভধারন এবং কম ওজনের বাচ্চা ধারন করার ফলে বাচ্চা এবং মায়ের উভয়ের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে।
- ✓ একই সময়ে বৃদ্ধি ও বাচ্চা ধারন করার ফলে ব্যাপক পুষ্টির অভাব হয়।

দুগ্ধবতী অবস্থার সময়ঃ

- ✓ মায়ের ওজন হ্রাস পায়
- ✓ বাচ্চাকে দুধ প্রদান করার ক্ষমতা কমে যায়
- ✓ বুকের দুধের পুষ্টির ঘনত্ব কমে যায়

বিভিন্ন বয়সে একদিনে কিশোর কিশোরীদের যা খেতে হবে

বয়স	ছেলে/মেয়ে	ভাত/রুটি	শাক-সবজি	ফলমূল	দুধ ও দুধের তৈরি খাবার	ডিম ও মাছ-মাংস
১১-১৩ বছর	ছেলে	৬/৭ টি রুটি বা ৩ থেকে সাড়ে ৩ কাপ ভাত	আড়াই থেকে ৩ কাপ	২ কাপ	৩ কাপ	১ টি ডিম ও পৌনে ১ কাপ মাছ মাংস
	মেয়ে	৬ টি রুটি বা আড়াই থেকে ৩ কাপ ভাত	আড়াই কাপ	২ কাপ	৩ কাপ	১ টি ডিম ও পৌনে ১ কাপ মাছ মাংস
১৪-১৫ বছর	ছেলে	৮/৯ টি রুটি বা ৪ থেকে সাড়ে ৪ কাপ ভাত	৩ থেকে সাড়ে ৩ কাপ	২ কাপ	৩ কাপ	১ টি ডিম ও ১ কাপ মাছ মাংস
	মেয়ে	৬ টি রুটি বা ৩ কাপ ভাত	আড়াই কাপ	২ কাপ	৩ কাপ	১ টি ডিম ও পৌনে ১ কাপ মাছ মাংস
১৬-১৯ বছর	ছেলে	৯/১০ টি রুটি বা ৪ থেকে ৫ কাপ ভাত	সাড়ে ৩ কাপ	২ - আড়াই কাপ	সাড়ে ৩ কাপ	১ টি ডিম ও দেড় ১ কাপ মাছ মাংস
	মেয়ে	৬/৭ টি রুটি বা ৩ থেকে সাড়ে ৩ কাপ ভাত	৩ কাপ	২ কাপ	৩ কাপ	১ টি ডিম ও ১ কাপ মাছ মাংস

কৈশোরকালীন বৈচিত্র্যময় খাবারের গুরুত্ব

কৈশোরকালে পুষ্টি সমস্যার সাথে প্রথাগত শারীরিক, মানসিক ও আর্থ-সামাজিক কারণ জড়িত থাকে। কৈশোরকালে খাবার এমন হতে হবে যেন সেই খাবার পরিমাণে সঠিক হয় এবং এতে খাদ্যের ৬ টি উপাদানই থাকে। একই খাবার বার বার খেতে ভাল লাগবে না তাই মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের খাবার দেওয়া ভাল এতে খাবারের রুচি থাকবে। কৈশোরে ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া ও খেলাধূলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিশোর কিশোরী সহ সবার জন্য ঘরে তৈরি খাবারই উত্তম। তাই তাদের ঘরে তৈরী করা পুষ্টিকর খাবার খেতে দিতে হবে।

তবে কৈশোরে ছেলে-মেয়েরা রাস্তার খোলা খাবার, চানাচুর, আচার, মুড়ালী, চটপটি, চিপস, আইসμম, কেক, কোমল পানীয়- জুস, এ্যানার্জী ড্রিংক ইত্যাদি মুখরোচক খাবার খায়। এগুলোতে চর্বি ও শর্করার মাত্রা বেশী থাকে যা পরবর্তী জীবনে স্থুলতা, হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিসের মতো রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

বাংলাদেশের কিশোর কিশোরীদের পুষ্টিগত অবস্থা

এফএসএনএসপি ২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশের ১০-১৮ বছরের কিশোর কিশোরীদের পুষ্টিগত অবস্থা যাহা শরীরের ভর সূচী (বিএমআই) পদ্ধতি অনুসারে নিরুপণ করা হয়েছে। নিম্নের গ্রাফের মাধ্যমে প্রদত্ত হল:

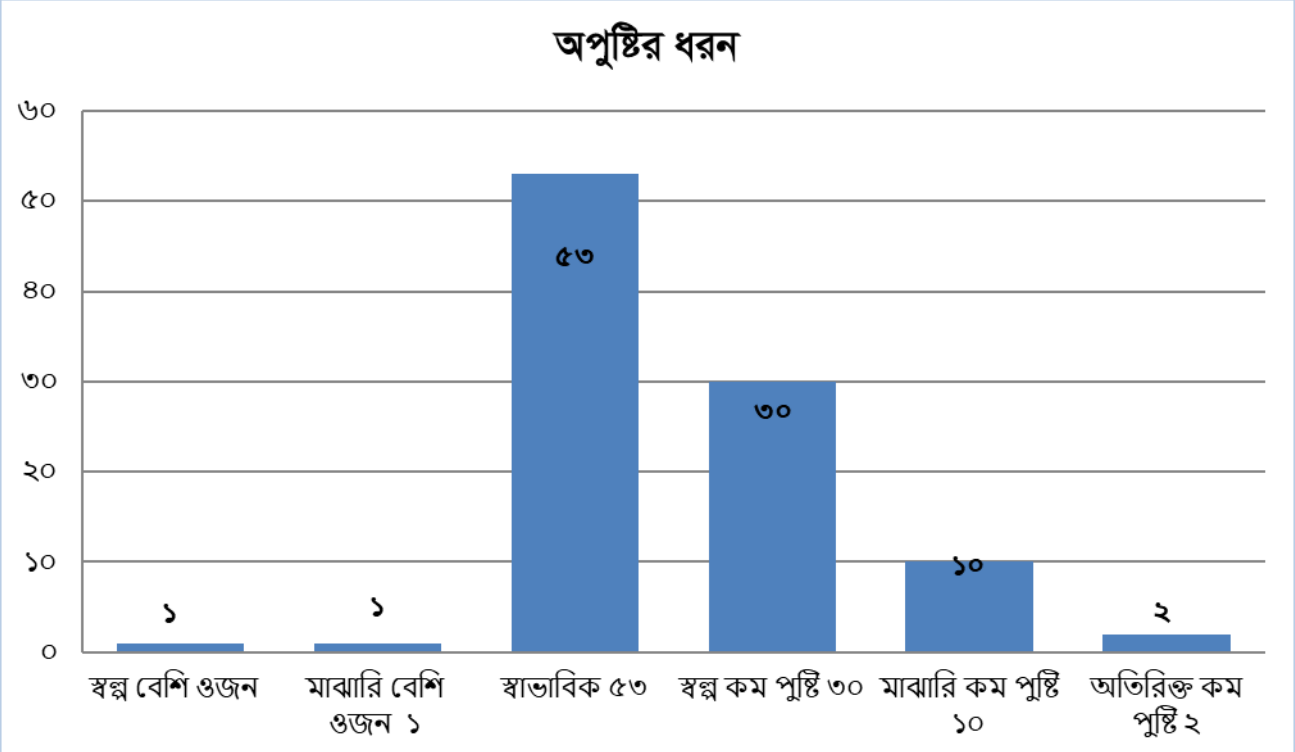

বাংলাদেশের কিশোরী মেয়েদের অপুষ্টির কারণ

- ✓ বাংলাদেশের কিশোরী মেয়েদের অপুষ্টির পেছনে মূলতঃ দু'টি কারণ - পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার না পাওয়া ও অল্প বয়সে গর্ভধারণ
- ✓ বৈশ্বিকভাবে দেখা গেছে, পরিণত বয়সের মায়ের গর্ভে সন্তানের মৃত্যুর ঘটনার দ্বিগুণ ঘটে ২০ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে।বাংলাদেশে ২০ বছরের কম বয়সী মায়েদের প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে জন্মদানে ৩১ জনের মৃত্যু হয়।
- ✓ ২০ বছরের বেশি বয়সী নারীদের গর্ভধারণ বা সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুর ঘটনার দ্বিগুণ ঘটে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে, এই হার পাঁচ গুণ হয় ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে।

কৈশোরকালীন অপুষ্টি প্রতিরোধে করণীয়

সুষম খাবার খাওয়া :

- ✓ শর্করা জাতীয় খাবার (ভাত, রুটি, মুড়ি, চিনি, গুড়, মধু, আলু, চিড়া ইত্যাদি) খাওয়া
- ✓ আমিষ জাতীয় খাবার (ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, ডাল, বাদাম, বীচি ইত্যাদি) খাওয়া
- ✓ আয়রন সমৃদ্ধ খাবার (মাংস, কলিজা এবং গাঢ় সবুজ শাক-সবজি) খাওয়া
- ✓ ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার (কলিজা, পাকা পেঁপে, আম, গাজর, মিষ্টিকুমড়া, ছোটমাছ, ডিম, সবুজ শাক-সবজি ও হলুদ রঙের ফল-মূল) খাওয়া
- ✓ প্রতিদিন ভিটামিন সি যুক্ত খাবার খাওয়া
- ✓ আয়োডিন সমৃদ্ধ খাবার (সামুদ্রিক মাছ এবং সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার শাক-সবজি) এবং আয়োডিন যুক্ত লবণ খাওয়া
- ✓ প্রতিদিন ১০- ১২ গ্লাস পানি খাওয়া। গরম কালে বেশি পানির প্রয়োজন হতে পারে
- ✓ খাবার খাওয়ার আগে ও পরে সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে হাত ধোয়া
- ✓ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা এবং জুতা বা স্যান্ডেল পরে পায়খানায় যাওয়া
- ✓ মাসিক ঋতুস্রাবের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। সব ধরণের খাবার খাওয়া যায় এবং তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এ সময় সব ধরণের স্বাভাবিক কাজ কর্ম করা যায়
- ✓ দেরীতে বিয়ে ও দেরীতে গর্ভধারণ করা

চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে রয়েছে তিন কোটি ৬০ লাখ কিশোর-কিশোরী। বয়ঃসন্ধি এমন একটা পর্যায় যখন একটি শিশু একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হয়ে ওঠে। এ সময়ই মানুষের মধ্যে প্রজনন ক্ষমতা তৈরী হয়। এই সময়ে ছেলে-মেয়ের মধ্যে বড় ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন আসে, যে কারণে তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, বয়ঃসন্ধিকালীন সেবা নিশ্চিতের পাশাপাশি তাদের সক্ষমতা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়ার মতো নীতি গ্রহণ করা গেলে এই ছেলে-মেয়েরা দারিদ্র্য, বৈষম্য ও সহিংসতার চক্র ভেঙে ফেলতে পারে। বাংলাদেশে তিন কোটি ৬০ লাখ কিশোর-কিশোরী রয়েছে, যারা এদেশের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ। তারপরেও তাদের উপযোগী করে সেবার ব্যবস্থা করার চিন্তা এখনও ততটা গুরুত্ব পায় না। এ বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়ছে। বাল্য বিয়ের উচ্চ হারের কারণে বাংলাদেশে বয়ঃসন্ধিকালেই অনেক মেয়ে গর্ভধারণ, সহিংসতা ও অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকে। বর্তমানে ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ৫৩ শতাংশেরই বিয়ে হয়েছে ১৮ বছর বয়সের আগে।

এই বয়সের ছেলে-মেয়ে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদেরও স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে সচেতনতার ঘাটতি থাকে। প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মানসিক ও সামাজিক বিষয়ে কাউন্সেলিং ইত্যাদির মতো বিষয়ে তারা অবগত নন।

এই অবস্থার কারণে বাংলাদেশে অনেক নবজাতকের মৃত্যু হয়। আবার সন্ড্রন প্রসবের পর মা ও শিশু রোগাক্রান্ত হন। বাংলাদেশে বয়ঃসন্ধিকালের তিনজন মেয়ের মধ্যে একজনই রুগ্ন।আর মেয়েদের ১১ শতাংশই অনেক বেশি রোগা-পাতলা। তাদের অধিকাংশেরই জিংক, আয়োডিন ও আয়রনের মতো অনুপুষ্টির ঘাটতি রয়েছে।

সমাধান

বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য সেবার অধিকার নিশ্চিত করতে প্রচারণা, সরকারি নীতিতে এ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা, উন্নততর সেবা প্রদানের ব্যবস্থা এবং কমিউনিটির ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের জন্য কাজ করছে ইউনিসেফ।

যৌবনে পদার্পণ্যোদতদের জন্য সহায়ক স্বাস্থ্য সেবা এবং বিশেষ কিছু জেলায় সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করার জন্যও কাজ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য নীতিতে তাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, তাদের প্রতি সহিংসতা রোধ এবং কিশোরী মায়েদের স্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্য সেবা এ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রমের একটি অংশে পুষ্টি, এইচআইভি, পয়ঃনিষ্কাশন, ঋতুকালীন পরিচ্ছন্নতা, জীবন দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা এবং গণমাধ্যমে অংশগ্রহণের মতো বিষয়ও রয়েছে। প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীরাও যাতে এসব সেবা পায় সে বিষয়টিও এখানে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

দুই পর্যায়ে সহায়তার ওপর গুরুত্ব দেয় ইউনিসেফ। প্রথমত, সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে সরকারকে সহায়তা করা হয়। যেমন, নীতি সংশোধন, কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মসূচি তৈরি।

দ্বিতীয়ত, যেসব জেলায় বাল্য বিয়ের হার অনেক বেশি সেসব জেলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেশের মধ্যে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ।

স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করে ইউনিসেফ। কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য, উন্নয়ন, সুরক্ষা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার আছেন তাদের দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্য ইউনিসেফ সেবা দাতা ও সামনের কাতারের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এছাড়া স্কুলে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ, হাত ধোয়ার জায়গায় সাবান রাখা ও স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে প্রচারপত্র ইত্যাদির মতো বিষয়গুলো যাতে ঠিকঠাক মতো হয় সেজন্য সরকার ও অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করে ইউনিসেফ। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো কেনা, বিতরণ এবং তা তদারক করা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে কাজ করা হয়।

সেশন-৯ঃ বয়স্কদের পুষ্টি

উদ্দেশ্য

- বয়স্কদের শারিরীক ও মানসিক সমস্যা সম্পর্কে অবগত হওয়া
- বয়স্কদের পুষ্টির চাহিদা ও সঠিক খাদ্য নির্দেশিকা সম্পর্কে সচেতন হওয়া

উপকরণ

- তিন সেট ফুড কার্ড
- ফেস্টুন
- মাল্টিমিডিয়া

- পদ্ধতি প্রদর্শন
- আলোচনা

প্রশিক্ষণার্থীদেরকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হবে। প্রতিটি দলে ১ সেট করে ফুড কার্ড দেওয়া হবে। উক্ত ফুড কার্ড হতে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণিতে বাছাই করবেন।

১. বয়স্কদের জন্য বর্জনীয় খাদ্যসমূহ
২. বয়স্কদের জন্য পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করা যায় এমন সকল খাদ্য
৩. বয়স্কদের জন্য বেশী পরিমাণে গ্রহণ করা যায় এমন খাদ্য

প্রতিটি দল কেবলমাত্র একটি করে শ্রেণির খাদ্যসমূহ নির্বাচন করবে এবং তা উপস্থাপ করবেন।

জীবনচক্রের প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করেই একজন মানুষ বার্ধ্যকে উপনীত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য অনুযায়ী মানবজীবনে বয়স্ককাল শুরু হয় ৬০ বছরের পর হতে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)-এর ২০১৮ সালের তথ্যানুযায়ী বর্তমানে ৬০ উর্ধ্ব বয়স্ক মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৭.৯%। ধারণা করা হচ্ছে, দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও গড় আয়ু (৭২.৩ বছর) বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আগামীতে এ সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী হবে।

৬০ বছরের পর বয়স্ককাল শুরু হলেও এর প্রায় ১০-১৫ বছর আগে থেকেই দেহে এর প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ৪০-৪৫ বছর হতে দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি ও কলার কার্যক্ষমতা হ্রাস পেতে আরম্ভ হয় বিশেষ করে থাইরয়েড, অগ্ন্যাশয়, বৃক্ক, হৃদপিন্ড প্রভৃতি। এই কারণে বিপাকের হার ও শক্তি চাহিদাও কমে যায়।

বয়স্ককালে শারিরীক সমস্যা

- দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি, কলা বা টিস্যুর কার্যকারিতা হ্রাস পায়, এই কারণে বিপাকের হার ও শক্তি চাহিদা হ্রাস পায়;
- পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ না করলে বা সূর্যেরআলোর সংস্পর্শে না থাকলে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি এর অভাব দেখা দেয়। ফলে হাড় নরম, সরু, পাতলা ও ভঙ্গুর হয়ে থাকে। এজন্য বৃদ্ধ বয়সে শরীরের কাঠামো দুর্বল ও শরীর ধনুকের মত বেঁকে যায় এবং অল্প আঘাতেই হাড় ভেঙ্গে যায়, তথা অস্টিওম্যালেসিয়া ও অস্টিওপোরোসিস রোগে আক্রান্ত হয়। এছাড়া এ বয়সে প্যারাথাইরয়েড হরমোন এর ক্ষরণ বৃদ্ধি পায় ফলে হাড়ক্ষয় রোগও বাড়তে থাকে;
- বয়স বৃদ্ধিরসাথে সাথে জিহ্বার স্বাদ অনুভূতিবা টেস্ট বাড হ্রাস পাওয়ায় খাদ্য গ্রহণের প্রবণতাও হ্রাস পায়। এছাড়াও লালারসের ক্ষরণ কমে যাওয়ায় মুখ শুষ্ক হয়ে থাকে এবং দাঁত ক্ষয়ও পড়ে যাওয়ার ফলে খাবারচিবিয়ে খেতে ও গিলতে কষ্ট হয়;
- পরিপাকতন্ত্রের কার্যক্ষমতা ও এনজাইমের ক্ষরণ হ্রাস পায়। কোষ্টকাঠিন্য, অর্শরোগ, অজীর্নতা প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়;
- হৃদপিন্ডের কার্যক্ষমতা কমে আসে, দৈহিক পরিশ্রমও কম হয়;
- রেচণতন্ত্রের (Renal Tract) কার্যক্ষমতা কমে আসে;
- রক্তস্বল্পতা, হজমের ব্যাঘাত হওয়ায় লৌহের পরিশোষণ কমে আসে; এবং
- স্নায়ুবিক জটিলতা হওয়ার ফলে Parkinson's ও Alzheimer's রোগ দেখা দেয়। এছাড়াও স্মরণশক্তি লোভ পায়।
- বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫০ বছরের পর মাসিক বা ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, একে মেনোপজ বলে। এই মেনোপজের সময় ডিম্বাশয় নিষ্ক্রিয় হয়ে পরার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা যায়। মূলত এই পরিবর্তন আসে ইস্ট্রজেন হরমোন কমে যাওয়ার ফলে। মেনোপজ হলে শরীরের বিভিন্ন হাড়ের জয়েন্টে ব্যাথা, রুক্ষ মেজাজ, হট ফ্ল্যাশ, দেহের মধ্যভাগে হঠাৎ করে চর্বি জমা, ভ্যাজাইনাল ড্রাইনেস, চুলকানি, ঘুম একেবারে কমে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা যায়।
- পুরুষদের ক্ষেত্রেও ৩০ বছরের পর থেকে প্রতি বছর টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রাও ১ শতাংশ করে কমতে থাকে। মূলত ৭০ বছরের পর পুরুষদেরও মেনোপজ হয়, যাকে অ্যান্ড্রোপজ বলা হয়।

বয়স্ককালে মানসিক সমস্যা

বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন শরীরিক সমস্যার সাথে সাথে বিভিন্ন মানসিক সমস্যাও দেখা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে ৬০ বছরের বয়সের উর্দ্ধে ১৫% মানুষ কোন না কোন মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বার্ধক্যজনিত মানসিক সমস্যায় মাঝে বিষন্নতা রোগ, উদ্বেগ জনিত রোগ, ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ রোগ, সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার বা দ্বি-প্রান্তিক আবেগীয় রোগ, প্রলাপ করা, ঘুমের সমস্যা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
বয়স্ককালে এ জাতীয় শরীরিক ও মানসিক সমস্যা, যা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে পুষ্টি চাহিদাকে প্রভাবিত করে।

বয়স্কদের পুষ্টি চাহিদা

- ✓ ৪০ বছর বয়স থেকেই শরীরিককর্মক্ষমতা হ্রাসসহ দেহে নানবিধ পরিবর্তন আসতে শুরু করে, তাই জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ ৪০ থেকে ৫৯ বছর বয়স পযন্ত প্রতি ১০ বছরের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরির শতকরা ৫ ভাগ কম গ্রহণ করার সুপারিশ করেছে। তারপর ৬০ থেকে ৬৯ বছর বয়সে ১০ ভাগ এবং ৭০ বছর বয়সের পর আরও ১০ ভাগ ক্যালরি কম গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছে।বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের খাদ্য শক্তির (ক্যালরি) চাহিদাও কমতে থাকে। যদিও এটা অনেকটাই নির্ভর করে তাদের কাজের ধরণ ও শরীরের পুষ্টির অবস্থার উপর। একজন বয়স্ক নারীর প্রতিদিন প্রায় ১৩০০ কিলোক্যালরিএবং পুরুষের ১৮০০ কিলোক্যালরিগ্রহণ করতে হবে (স্বাস্থ্যগত অবস্থা বিবেচনা করে);

- ✓ বয়স বাড়ায় সাথে সাথে দেহ কোষের ক্ষয় বেশিহয় বলে ক্ষয়পূরণকারী খাদ্য (আমিষ) যেমন- মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ডাল ইত্যাদি বেশিকরে দিতে হবে। এ সময় প্রায় প্রতি কেজি শরীরের ওজনের জন্য০.৮-১.০ গ্রাম আমিষ গ্রহণ করতে হবে। খেয়াল বাখতে হবে মোট শক্তি চাহিদার ১১-১২ শতাংশ যেন আমিষ থেকে আসে। এই আমিষের অন্তত এক তৃতীয়াংশ প্রাণিজ আমিষ থেকে গ্রহণ করা ভালো। এছাড়াও বাদাম, শস্য ও ডাল জাতীয় খাদ্য, যাতে আমিষের পরিমাণ বেশি তা গ্রহণ করতে হবে। বয়স্ককালে পর্যাপ্ত আমিষ গ্রহণ না করলে শরীরে বিশেষ করে পায়ে পানি জমে। একে গাফোলা রোগ বা Edema বলে;

- ✓ বয়স্ককালেসহজেই বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি আক্রমণ করে। এজন্য এসময় রোগ প্রতিরোধকারী পুষ্টি উপাদান যেমন খনিজ লবণ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।সবুজ পাতা জাতীয় শাক, অন্যান্য সবজি ও তাজা ফলমূল বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন ও খণিজ উপাদানের ভান্ডার হিসাবে পরিচিত। তাই তাদের ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের অভাব পূরণের জন্য পর্যাপ্ত শাক-সবজি ও ফলমূল দৈনিক খাদ্য তালিকায় থাকতে হবে;

- ✓ অধিকাংশ সময়ে দেখা যায় এবয়সে অনেকে কোষ্টকাঠিন্যে ভূগে থাকে। কোষ্টকাঠিন্য দুর করার জন্য আঁশ জাতীয় খাদ্য যেমন শাক-সবজি ও ফল-মূল খেতে হবে। শাক-সবজি খেতেকারও অসুবিধা হলে দিনে অন্তত ২ (দুই) বার ফল গ্রহণ করতে হবে। তবে ডায়াবেটিস রোগীদের ফল খাওয়ার ক্ষেত্রে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (Glycemic Index) এর মান বিবেচনায় নিতে হবে।তাছাড়া কোষ্টকাঠিন্য দুর করার জন্য ইসুবগুলের ভূষিও খাওয়া যেতে পারে;
- ✓ বিশুদ্ধ পানি প্রতিদিন পান করতে হবে;

- ✓ বয়স্কদেরশরীরের ওজন বাড়তে থাকলে কার্বহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য যেমনঃ- ভাত, চিনি, রুটি ইত্যাদি অল্প পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। এ সময় চর্বি জাতীয় খাদ্য গ্রহণেবৃদ্ধদের হজমে গন্ডগোল দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডযুক্তখাদ্য, যেমন- ঘি, মাখন, প্রাণিজ চর্বি ইত্যাদি পরিহার করা উচিত। এসব খাদ্যে কোলেস্টেরল জাতীয় পদার্থ বেশী থাকায় রক্তের শিরায় জমা হয়ে রক্ত চলাচলের বাধা সৃষ্টি করে। ফলে হৃদরোগ ও ষ্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে পরিমিত পরিমাণে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড যেমন উদ্ভিজ্জ তেল, সামুদ্রিক মাছের তেল খাওয়া যেতে পারে;
- ✓ কিডনির সমস্যা থাকলে অনেক সময় বয়স্ককালেনেগেটিভ পানি ভারসাম্য (water balance) দেখা যায়। এ সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান না করলে পানি শূন্যতা, নিম্ন রক্তচাপ, শ্লেষ্মাঝিল্লীর (mucosa) শুষ্কতা, শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায় এবং প্রসাব (Urine output) কম হবে। তাই প্রতিদিন প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি পান করতে হবে। সুস্থতার জন্য পানি পানের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রতি ক্যালরির জন্য ১ মিলি বা প্রতি কেজি শরীরের ওজনের জন্য ২৫-৩০ মিলি বিশুদ্ধ পানি প্রতিদিন পান করতে হবে;
- ✓ বয়স্কদেরসাধারণতঃ ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড় নরম, পাতলা ও ভঙ্গুর হয়ে থাকে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাদ্য যেমন দুধ, দই ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্য, মাছ ও শাক-সকজি খেতে হবে;
- ✓ বার্ধক্যে বিশেষ ধরণের রক্তস্বল্পতা দেখা যায়, একে পার্নিসিয়াস এ্যানেমিয়া (Pernicious Anaemia) বলে। প্রধানত ভিটামিন বি$_{১২}$ (কোবালামিন) এর অভাবে এই রক্তস্বল্পতা দেখা যায়। ভিটামিন বি$_{১২}$সাধারণত প্রাণিজ খাদ্য উৎস থেকে পাওয়া যায়, যেমন- যকৃত, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি। এছাড়ালৌহের অভাবেও রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। তাই এ সময় লৌহসমৃদ্ধ খাদ্য যেমন কলিজা, ডিম, আটা, শাক-সবজি ও ফলমূল খেতে হবে। ভিটামিন সি শরীরে লৌহের শোষণ বৃদ্ধি করে। কাজেই বয়স্কদেরভিটামিন সি যুক্ত খাদ্য (পেয়ারা, কূল, আমলকি, জাম্বুরা) খেলে লৌহের শোষণ বৃদ্ধির সাথে সাথে ভিটামিন সি এর চাহিদাও পূরণ হবে;
- ✓ পরিমিত পরিমাণ লবণ খেতে হবে এবং ভাতের সাথে আলাদাভাবে লবণ খাওয়া হতে বিরত থাকতে হবে। কারণ, অতিরিক্ত লবণ গ্রহণে শরীরে সোডিয়ামের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং শরীর থেকে অতিরিক্ত ক্যালসিয়ামের নিঃসরণ ঘটায়। যার ফলে হাড়ের ঘনত্ব কমে যায়। এছাড়াও রক্তনালীতে লবণের পরিমাণ বেড়ে গেলে রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় রক্তনালীতে পানির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং সর্বোপরি যার ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়;
- ✓ বিভিন্ন ধরণের রোগ ও ক্যান্সার প্রতিরোধে পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ শাক-সবজি ও ফলমূল খাদ্য তালিকায় থাকতে হবে। যেমন: ভিটামিন-সি, ভিটামিন-ই এবং বিভিন্ন ধরণের ক্যারটিনয়েড (Lutein, Lycopene, Cryptoxanthin);
- ✓ এসময় শরীরে ভিটামিন-এ এর চাহিদা কমে যায় এবং একই সাথে রিবোফ্লাভিন, ভিটামিন-বি$_{৬}$, বি$_{১২}$ এবং খনিজ উপাদান জিংক এর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়;
- ✓ ক্ষূধা মন্দা ও মুখের অরুচি বয়স্কদেরএকটি সাধারণ সমস্যা। বি গ্রুপের ভিটামিনগুলো ক্ষুধা মন্দা দূর, মুখের রুচি বৃদ্ধি, খাদ্যদ্রব্য হজম, পরিপাক ও বিপাকে সহায়তা করে থাকে। কাজেই বৃদ্ধদের বি গ্রুপের ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্যগুলো বেশী করে খেতে হবে;
- ✓ বয়স্কদের হালকা ব্যায়াম, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জটিলতা হ্রাস করে শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে। ব্যায়ামের ফলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন- পেশী, হৃদপিন্ড, পাকস্থলি, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, অস্থি, রক্ত চলাচল ইত্যাদিকে সচল, সবল ও মজবুত করে। নিয়মিত ব্যায়াম অকাল বৃদ্ধরোধ, বহুমুত্র, রক্তচাপ, শরীরের ওজন ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ, হৃদরোগ ও ষ্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। তাছাড়া ব্যায়ামের ফলে সুস্থবোধ, মানসিক প্রফুল্লতা, ভাল ঘুম, কাজ-কর্মে আনন্দ, মস্তিষ্কেও কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও হজম শক্তি বৃদ্ধি করে

পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা বয়স্কের পুষ্টি চাহিদার উপর ভিত্তিকরে নতুন একটি ফুড পিরামিড (Food pyramid diagram) প্রণয়ন করেছেন। যাতে কোনখাদ্য বিভাগ হতে কতটা খাবার গ্রহণ করবে তা ধারণা করা যায়। পিরামিডে যে সকল খাদ্য উপরের দিকে আছে তা কম পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। এখানে প্রতিদিনের খাদ্য গ্রহণের অনুমোদিত পরিবেশন হচ্ছে নিম্নরূপ:

১। শস্য জাতীয় ৬ পরিবেশন;

২। শাক-সবজি ৩ পরিবেশন;

৩। ফল ২ পরিবেশন;

৪। মাছ, মাংশ, বীচি, ডিম, বাদাম ২ পরিবেশন;

৫। দুধ, দই, পনির ৩ পরিবেশন;

৬। সর্বোপরি কম স্থান জুড়ে আছে তেল, চর্বি, মিষ্টি জাতীয় খাবার, যা পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে।

বিশেষজ্ঞরা বয়স্কে পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ না করা ও স্বাভাবিকের থেকে কম ওজন হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত নয়টি কারণ উল্লেখ করেছেন। যাকে Nine "Ds" বলে অ্যাখ্যা দেয়া হয়।

Disease	**D**ementia	**D**isguise
Depression	**D**ysphagia	**D**ysfunction
Drugs	**D**entition	**D**iarrhea/Malabsorption

স্বাভাবিকের চেয়ে ওজন কমে যাওয়ার প্রায় ২৫ শতাংশ কারণ এখনও নির্ণয় করা যায়নি। তবে বিশেষ করেনিম্নোক্ত তিনটি কারণকে দায়ী করা হয়।

- ✓ Depression
- ✓ Gastrointestinal Tract dysfunction (peptic ulcer on motility disorders)
- ✓ Cancer

খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকা

- প্রতিদিন পর্যাপ্ত ক্যালরি গ্রহণ করতে হবে। যাদের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাদের ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা সঠিক ভাবে পরিমাপ করতে হবে। ওজনাধিক্য হলে বিভিন্ন ধরণের অসংক্রামক রোগ যেমন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতিতে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে;
- দুই গ্লাস কম চর্বিযুক্ত/ ননীতোলা দুধ (১ গ্লাস=২৫০ মি:লি:) এবং সমপরিমাণ দুগ্ধজাতীয় খাবার প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় থাকতে হবে;
- অধিক চর্বিযুক্ত প্রাণিজ আমিষ যেমন: গরু ও খাসীর মাংস, টার্কি ইত্যাদি পরিহার করতে হবে। এক্ষেত্রে আমিষের চাহিদা পূরণে ডিমের সাদা অংশ, মুরগীর মাংস ও মাছ খেতে হবে। তবে হৃদরোগ, কোলেস্টেরল ও উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা না থাকলে প্রতিদিন একটি কুসুমসহ ডিম খাওয়া যেতে পারে;
- রান্নায় প্রতিদিন ১৫-২০ গ্রাম ভোজ্য তেল ব্যবহার করতে হবে। তেল এবং চর্বি জাতীয় খাদ্যের চাহিদা পূরণে প্রাণিজ তেল/ চর্বির পরিবর্তে বাদাম ও তেলবীজ জাতীয় খাদ্য আহার করতে হবে;
- প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় আঁশযুক্ত দানাদার খাদ্য ও উত্তমরুপে রান্নাকৃত ডাল থাকতে হবে;
- বিভিন্ন ধরনের সালাদ (যেমন: শসা, লেটুস পাতা ইত্যাদি) খেতে হবে। কারণ, শসা এবং অন্যান্য সালাদ হিসাবে খাওয়া যায় এমন ফল-সবজিতে দ্রবণীয় আঁশ থাকে, যা রক্তের কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে;
- খাদ্য তালিকা হতে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্য পরিহার করতে হবে। কারণ প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্যে উচ্চ মাত্রায় চর্বি, লবণ, চিনি এবং প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা হয়;
- বৃদ্ধ বয়সে খাদ্যের পছন্দ, অপছন্দ বিবেচনা করেখাদ্য সুষম করা উচিত। আহার পাঁচমিশালি, হজমোপয়োগী হতে হবে। তরল দুধ বা সবজি সুপ ক্ষুধা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে;
- সারাদিনের শক্তি চাহিদা অনুযায়ী খাবারকে ছোট ছোট অংশে নির্দিষ্ট বিরতিতে আহার করতে হবে;
- খাদ্যদ্রব্য অতিরিক্ত না ভেজে সিদ্ধ/ভাঁপানো/পুড়িয়ে আহার করতে হবে;
- দৈনিক হাঁটাচলা ও কিছুটা শারীরিক পরিশ্রম সুস্থতার জন্য আবশ্যক;
- চা, কফি, পান-জর্দা, সিগারেট, নেশাজাতীয় দ্রব্য প্রভৃতি খাওয়া পরিহার করা উচিত;এবং
- সর্বোপরি খাদ্য গ্রহণের সময় স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণনির্দেশিকা মেনে চলতে হবেএবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।

সেশন-১০ঃ পুষ্টিগুণ অক্ষুন্ন রেখে ফলিত পুষ্টি জ্ঞানের আলোকে খাদ্যদ্রব্য রন্ধন প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

- পুষ্টি জ্ঞানের আলোকে খাদ্য উপকরণ নির্বাচনে দক্ষতা অর্জন করা
- সঠিক নিয়মে খাদ্য উপকরণ প্রস্তুতকরণ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা
- পুষ্টিমান বজায় রেখে রন্ধন প্রক্রিয়ার কৌশলের উপর দক্ষতা অর্জন করা

উপকরণ

- সতেজ শাক-সবজি
- পাতিল
- চুলা
- ম্যাচ
- ছুরি বা বটি
- ঢাকনা
- জ্বালানী
- ফেস্টুন

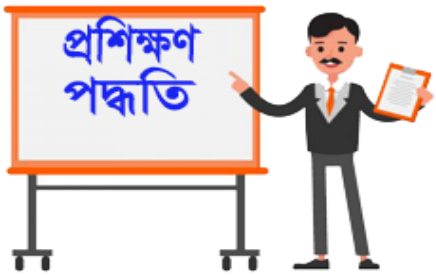

- দলীয় আলোচনা
- প্রদর্শনী

(ক) সঠিক উপায়ে খাদ্য উপকরণ নির্বাচন ও ক্রয়

(১) খাদ্য তালিকায় পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য উপাদানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করাঃ

- অধিক পরিমাণে শাক-সবজি ও ফলমূল সংযোজন।
- গাঢ় বর্ণের শাক-সবজি ও ফলমূল সংযোজন। ফ্যাকাশে বর্ণের শাক-সবজি/ফলমূল হতে গাঢ় বর্ণে অধিক পরিমাণে ভিটামিন বিদ্যমান।

(২) স্থানীয় বাজার থেকে সতেজ শাকসবজি ক্রয় করাঃ

- স্থানীয় বাজার থেকে পরিপক্ক ও সতেজ পাতা ও ফল জাতীয় শাক-সবজি ক্রয় করা।
- বাসি বা পুরাতন সবজি ক্রয় না করা, কারণ এতে ফসল সংগ্রহত্তোর কার্যক্রমের জন্য পুষ্টিগুণ হ্রাস পায়।
- অধিকাংশ ফল সবজি সঠিক পরিপক্কতা পর্যায়ে পুষ্টিমান সবচেয়ে বেশি হয়। তাই ফল সবজি ক্রয়ের সময় সঠিক পরিক্কতার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া।

খাদ্য উপকরণ নির্বাচন ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

খাদ্য উপকরণের নাম	ক্রয় করা যাবে	ক্রয় করা যাবে না
চাল	✓ অপলিশকৃত (আঁশযুক্ত) চাল ক্রয় করা। ✓ ফর্টিফাইড চাল ক্রয় করা। ✓ প্যাকেটকৃত চাল ক্রয় করা। ✓ সম্পুর্ণ দানার চাল ক্রয় করা। ✓ শুষ্ক চাল ক্রয় করা।	✓ অপলিশকৃত আঁশবিহীন চাল ✓ দুর্গন্ধযুক্ত চাল ✓ পোকামাকড় আক্রান্ত চাল ✓ পাথর, ধুলাবালি যুক্ত চাল ✓ ভেজা চাল
ডাল	✓ প্যাকেটকৃত ও সিলকৃত ডাল ✓ পরিস্কার ও পোকামাকড় মুক্ত ডাল	✓ দুর্গন্ধযুক্ত ডাল ✓ পোকামাকড় আক্রান্ত ডাল ✓ পাথর, ধুলাবালি যুক্ত ডাল
শাক-সবজি	✓ সতেজ, মৌসুমী এবং স্থানীয় বাজারে পাওয়া শাক-সবজি ✓ গাঢ় বর্ণের শাক-সবজি	✓ থেতলে যাওয়া, পোকামাকড় আক্রান্ত, হলদে পাতা, নেতিয়ে পড়া শাক-সবজি

খাদ্য উপকরণ নির্বাচন ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ		
খাদ্য উপকরণের নাম	**ক্রয় করা যাবে**	**ক্রয় করা যাবে না**
আলু	✓ পরিস্কার ও দৃঢ় টিউবার	✓ কুঁচকানো, নরম, সবুজ, অঙ্কুরিত এবং থেতলানো আলু।
তেল	✓ প্যাকেটকৃত ও ফর্টিফাইড তেল	✓ খোলা তেল
মসলা	✓ প্যাকেটজাত মসলা	✓ তুলার মত কিছু দেখা গেলে ✓ অপ্রীতিকর গন্ধ ✓ পোকামাকড়ের উপস্থিতি ✓ মন্ডের উপস্থিতি ✓ কৃত্রিম উজ্জ্বল রং

খাদ্য উপাদান নির্বাচনের সময় দূষণ (contamination) হওয়ার সম্ভবনার মাত্রাঃ

সব ধরণের খাদ্য উপাদানই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দূষণ (contamination) হওয়ার ঝুঁকি আছে। এ ধরনের ঝুঁকি আরও বেড়ে যায় যখন খাদ্য নির্বাচন, সংরক্ষণ, নাড়াচাড়া এবং প্রস্তুত সঠিক ভাবে না হয়।

উচ্চ দূষণ ঝুঁকি সম্পন্ন খাবার (High Risk foods) ঃ

এ ধরণের খাবার সাধারণ বা কক্ষ তাপমাত্রায় খুব কম সময় ভালো থাকে। এদেরকে উচ্চ পচনশীল বা Highly Perishable খাবারও বলা যায়। এধরণের খাবার খুব দ্রুত প্যাথজেনিক অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং খেলে খুব সহজেই মানুষ রোগাক্রান্ত হয়।

উদাহরণঃ কাঁচা মাছ, মাংস, দুধ ও রান্না করা ভাত, ডাল, তরকারি ইত্যাদি।

মধ্যম দূষণ ঝুঁকি সম্পন্ন খাবার (Medium Risk foods) ঃ

এ ধরণের খাবার সাধারণ বা কক্ষ তাপমাত্রায় ২/৩ দিন হতে ২/৩ সপ্তাহ পর্যন্ত ভালো থাকে। এদেরকে মাঝারী পচনশীল বা Medium Perishable খাবার বলা হয়।

উদাহরণঃ ফল জাতীয় সবজি, ফলমূল, ডিম ইত্যাদি।

কম দূষণ ঝুঁকি সম্পন্ন খাবার (Minimum Risk foods) ঃ

এই ধরণের খাবার অনেক দিন ধরে সাধারণ তাপমাত্রায় ভালো থাকে। অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

উদাহরণঃ চাল, ডাল,আটা, তেল ইত্যাদি.

(৩) প্রতিদিনের জন্য যতটুকু শাক-সবজি ক্রয় করা প্রয়োজন তাই ক্রয় করা ঃ

কারণ, সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলেও শাক-সবজির পুষ্টিগুণ সময়ের সাথে সাথে হ্রাস পেতে থাকে।

(৪) খাদ্য উপকরণ ক্রয়ের সময় বৈচিত্রতার উপর গুরুত্ব দেওয়াঃ

- ✓ ক্রয় করার ক্ষেত্রে একই দিনে বিভিন্ন বর্ণের পাতা জাতীয় সবজি ও ফলমূল ক্রয় করা। এতে অধিক পুষ্টি নিশ্চিত করে।
- ✓ খিচুড়ী রান্নার সময় একের অধিক ডাল ব্যবহার করা, এতে অধিক পুষ্টি নিশ্চিত করে।
- ✓ ফর্টিফাইড তেল ও চাল ব্যবহার করা।

(খ) সঠিক উপায়ে রান্নার জন্য খাদ্য উপকরণ প্রস্তুতঃ

- ✓ প্রথমেই শাক-সবজি বাছাই করে ভালভাবে চলমান পরিস্কার পানিতে (Running water) ধুয়ে নিতে হবে।
- ✓ যতটুকু সম্ভব সবজির ত্বকসহ বড় বড় করে কাটতে হবে। কারণ, ত্বকের নীচে পুষ্টিমান বেশী থাকে। যেমনঃ কাঁচা মিষ্টি কুমড়া।
- ✓ কখনই শাক-সবজি কাটার পর পানিতে ভিজিয়ে রাখা যাবে না, এতে পানিতে দ্রবীভূত পুষ্টি উপাদান যেমন: ভিটামিন-বি, ভিটামিন-সি ও বিভিন্ন খনিজ উপাদানের অপচয় হয়।
- ✓ শাকসবজি ছোট ছোট টুকরা করে কাটা হলে পৃষ্টতলের (Surface Area) পরিমাণ বেড়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে অধিক পরিমাণে বাতাস, পানি ও আলোর সংস্পর্শ পায়, যা পুষ্টি উপাদান অপচয় বৃদ্ধি করে ।

(গ) সঠিক উপায়ে রান্না করাঃ

- ✓ প্রথমেই খাবার তৈরি ও রান্নার পূর্বে দুই হাত সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিন। এরপর রান্নার কাজে ব্যবহৃত হাঁড়ি-পাতিল, চামচ, ঢাকনা, দাঁ-বটি ইত্যাদি নিরাপদ পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিন।
- ✓ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে রান্না না করলে জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

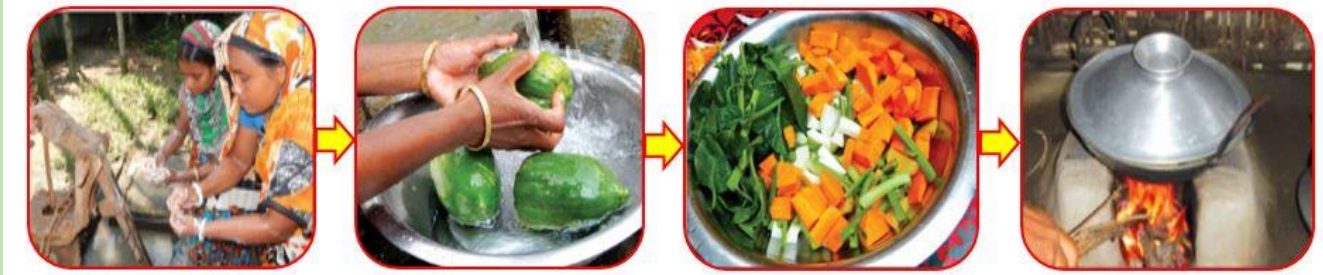

শাক-সবজি রান্না ও খাওয়ার আগে নিরাপদ পানি দিয়ে ভাল ভাবে ধুয়ে নিতে হবে | শাক-সবজি বড় বড় টুকরা করে কাটা | ঢাকনা দিয়ে পরিমিত সময়ে রান্না করা

- ✓ ঢাকনা দিয়ে রান্না করতে হবে। কারণ,
  - ○ ঢাকনা দিয়ে রান্না করলে প্রোটিন, কার্বহাইড্রেট, বায়োটিন ও নায়াসিন তুলনামূলকভাবে খাদ্যদ্রব্যে ভালভাবে সুস্থিত (Stable) হয়।
  - ○ ভিটামিন A, D, E, K, ভিটামিন B-6, রিবোফ্লাবিন এবং ক্যারোটিন তাপের প্রতি তুলনামূলকভাবে সংবেদনশীল হওয়ায় ঢাকনা দিয়ে রান্না করলে উক্ত ভিটামিনসমূহ কম হ্রাস পায়।
  - ○ ভিটামিন সি, ফলিক এসিড এবং থায়ামিন তাপের প্রতি অধিক সংবেদনশীল হওয়ায় উক্ত ভিটামিনসমূহ খাদ্যদ্রব্যে নিশ্চিত করতে হলে ঢাকনা দিয়ে রান্না করতে হবে।
- ✓ মাঝারী তাপে রান্না করলে সকল ভিটামিন ও খনিজ লবণ বজায় থাকে।
- ✓ শাক-সবজি উচ্চ তাপে কম সময়ে নির্দিষ্ট রঙ বজায় রেখে রান্না করুন।
- ✓ মাংস রান্নার সময় কম তাপে অধিক সময় ধরে রান্না করুন।

সেশন-১১ঃ সংরক্ষণ

উপকরণ

- সংরক্ষণ পাত্র
- পলিথিন
- শুকনো নিম
- ছিদ্রকারী মেশিন (Punch Machine)

- খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণের পদ্ধতি প্রদর্শন করা
- MAP-এর পদ্ধতি প্রদর্শনী আয়োজন করা

উদ্দেশ্য

- খাদ্য উপাদান সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবেন
- Modified Atmosphere Packaging (MAP) পদ্ধতি বিষয়ে ধারণা ও দক্ষতা অর্জন

দানাদার ও ডাল জাতীয় খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ

- ✓ মাটি থেকে উঁচু জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।
- ✓ পাত্রটি বায়ু ও আলো নিরোধ হতে হবে।
- ✓ শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ✓ পাত্রে খাদ্য দ্রব্য রাখার পর ফাঁকা থাকলে তা শুকনা নিমের পাতা দ্বারা পূরণ করে রাখতে হবে।

সবজি সংরক্ষণ

অতিরিক্ত সবজিসমূহ ছিদ্রযুক্ত পলিথিনে (MAP-Modified Atmosphere Packaging) সংরক্ষণ করতে পারি। মডিফাইড অ্যাটমসফিয়ার প্যাকেজিং **(MAP)** হচ্ছে এমন একটি সাধারণ ও সস্তা প্যাকেজিং ব্যবস্থা যার মাধ্যমে পরিবহন কিংবা স্টোরেজের সময় সবজির গুণগতমান বজায় রাখা যায়। এই প্রক্রিয়ায় একক ফল বা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যকে পলিব্যাগের মধ্যে রেখে সীলিং করা হয়। পণ্যের প্যাকেজিং কন্টেইনারে লাইনার হিসেবে কিংবা প্যালেট ঢাকার কাজেও **MAP** ব্যবহার করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় পলিব্যাগের ভিতরে নিম্নমাত্রায় অক্সিজেন (O_2), উচ্চমাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস ও উচ্চমাত্রায় আর্দ্রতা বিরাজ করে। এই অবস্থায় সবজির শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়া হ্রাস পায়, পানির অপচয় কমে যায়, ফল পাকানো বা নষ্ট হওয়া রোধ করে এবং সর্বোপরি ফসলের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পায়। ম্যাপ প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে সাধারণত: ২৫ মাইক্রন পুরু (০০১ লেভেল) কম ঘনত্বের পলিথিন (LDPE), বেশি ঘনত্বের পলিথিন (HDPE) বা পলি প্রোপাইলিন (PP) ব্যবহার করা উচিত। বেশী পুরু পলিথিন (০০২-০০৪) ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এতে পণ্য পঁচে যেতে পারে। শুধুমাত্র ভাল মানের ফল বা সবজিই **MAP** সংরক্ষণ করতে হবে। পাকা ও কাঁচা ফল আলাদা রাখতে হবে যাতে পাকা ফল কর্তৃক উৎপাদিত ইথিলিনের প্রভাবে অন্য ফল না পাকে। সাধারণ কক্ষ তাপমাত্রায় ফসলের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে **MAP** এ রাখা সবজি/ফল ৩-১০ দিন পর্যন্ত রাখা যায় যা সাময়িকভাবে স্টোরেজ বা দীর্ঘ পরিবহনের জন্য যথেষ্ট। তবে **MAP** প্যাকেজিং এ দীর্ঘদিন সবজি/ফল সংরক্ষণ করলে তা পঁচে যেতে পারে।

আবার আলু, রসুন, পেঁয়াজ পাতলা স্তর করে প্লাস্টিক বা কাঠের তৈরি র‍্যাকে আলো বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে সংরক্ষণ করা যায়।

তেল সংরক্ষণ

- ✓ ঠান্ডা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে।
- ✓ ভাল ছিপিযুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করা।
- ✓ চুলা বা সূর্যালোক থেকে দূরে সংরক্ষণ করা।

মসলা সংরক্ষণ

পরিস্কার, লেবেলযুক্ত ও বায়ু নিরোধ পাত্রে সংরক্ষণ। শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

বিভিন্ন তাপমাত্রায় খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ

কক্ষ তাপমাত্রায়	কক্ষের শীতল স্থানে	ফ্রিজে সংরক্ষণ

সেশন-ঃ ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার

উদ্দেশ্য

- ভেষজ উদ্ভিদ সর্ম্পকে জ্ঞান লাভ
- ভেষজ উদ্ভিদের ঔষধি গুণ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চত করা
- ভেষজ উদ্ভিদ চাষে উৎসাহিত করা

গল্প বলা

দলীয় আলোচনা

ভেষজ উদ্ভিদ কি ?

ভেষজ উদ্ভিদ হচ্ছে এমন গাছ যা সাধারণত খাদ্য, স্বাদবৃদ্ধি, ঔষধ অথবা সুগন্ধের জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারনত ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত উদ্ভিদ গুলোকে ভেষজ উদ্ভিদ বলা হয়। উদ্ভিদের পাতা, ফুল, ফল, শিকড়, বীজ, ছাল-বাকল, কষ, ফলের খোসা সবকিছুকেই নির্দেশ করা হয়।

ভেষজ উদ্ভিদ চাষের গুরুত্ব

- ✓ ভেষজ ওষুধ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিভিন্ন ঔষধি উদ্ভিদ উৎস থেকে সংগ্রহ বা আহরণ করা হয়। সাধারণত বনে-জঙ্গলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মে থাকা ঔষধি উদ্ভিদ থেকেই ভেষজ ওষুধের কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে জমিতে চাষকৃত উৎস থেকে ঔষধি উদ্ভিদ সংগ্রহ বাঞ্ছনীয়, না হলে একসময় প্রকৃতি ভেষজ উদ্ভিদ শূন্য হয়ে পড়বে। তাছাড়া চাষকৃত ভেষজ উদ্ভিদের গুণগতমান অনেক উন্নত হয়ে থাকে। চাষের আওতায় ঔষধি উদ্ভিদের উৎপাদন ও আহরণ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে তা সংগ্রহ করার সুযোগ থাকে। বন্য উৎস থেকে সংগৃহীত কাঁচামালের ক্ষেত্রে এ ধরনের নিশ্চয়তা থাকে না। এ ক্ষেত্রে ভুল উদ্ভিদ ও দ্রব্য আহরণের যেমন আশঙ্কা থাকে তেমনি অসময়ে আহরিত নিম্নমানের কাঁচামাল সরবরাহেরও প্রচুর সুযোগ থাকে। অসময়ে, অপ্রাপ্ত বয়সে ও ভ্রান্ত পদ্ধতিতে সংগৃহীত ঔষধি উদ্ভিদ দ্বারা ভেষজ ওষুধ তৈরি হলে তা কখনো গুণগত মানসম্পন্ন হয় না।

- ✓ ভেষজ উদ্ভিদ যথেষ্ট মাত্রায় পরিবেশবান্ধব। প্রায় সব ভেষজ উদ্ভিদেরই পরিবেশ বিশুদ্ধকরণের ক্ষমতা রয়েছে। ভেষজ উদ্ভিদ বাতাসে বিরাজমান বিভিন্ন রোগ জীবাণুকে প্রাকৃতিকভাবে বিনষ্ট করতে সক্ষম। তাই অধিকহারে ভেষজ উদ্ভিদের চাষ আমাদের ক্রমশ দূষিত হয়ে পড়া পরিবেশ বিশুদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- ✓ অধিকাংশ ভেষজ উদ্ভিদ চাষে কৃত্রিম কীটনাশক ও সার প্রয়োজন হয় না। অধিকাংশ ভেষজ উদ্ভিদ থেকে সারা বছর ধরে অথবা খুব অল্প সময়ে ফল বা প্রয়োজনীয় অংশ সংগ্রহ করা যায়। এ কারণে তুলনামূলক ভাবে ভেষজ উদ্ভিদ চাষে বিনিয়োগ অনেক কম কিন্তু লাভ বেশি।
- ✓ মাশরুমসহ আরো বেশ কিছু ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে যা চাষে জায়গা খুবই কম লাগে, তাই ভূমিহীন বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ভেষজ উদ্ভিদ চাষ উপযোগী।
- ✓ আর্থিক বিশ্লেষণে ভেষজ উদ্ভিদের চাষ অন্য যেকোনো কৃষির চেয়ে অনেক বেশি লাভজনক।
- ✓ দেশে-বিদেশে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যাপক চাহিদা থাকার কারণে ভেষজ উদ্ভিদ বিক্রি বা বাজারজাতকরণে কৃষককে তেমন বেগ পেতে হযনা। এ কারণে ভেষজ উদ্ভিদ চাষে ঝুঁকি কম।
- ✓ ভেষজ উদ্ভিদ চাষ অপেক্ষাকৃত কম শ্রমসাধ্য। ভেষজ উদ্ভিদে খুব বেশি পরিচর্যা প্রয়োজন হয় না, তাই নারীর অংশগ্রহণে পারিবারিক পর্যায়ে ভেষজ উদ্ভিদের চাষ সম্ভব।
- ✓ দেশে ব্যাপকভাবে ভেষজ উদ্ভিদের চাষ সম্ভব হলে ভেষজ চিকিৎসা ও ভেষজ ওষুধ আরো বেশি সহজলভ্য হবে, ফলে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা ব্যয় কমবে।

বাংলাদেশে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার

বাংলাদেশে বার্ষিক কী পরিমাণ ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয় তার কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে আমাদের দেশে বর্তমানে প্রায় ৩ শতাধিক ইউনানী ও ২ শতাধিক আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে বহু ভেষজ প্রসাধনী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানে বছরে ২০ হাজার টনেরও বেশি ভেষজ কাঁচামালের চাহিদা রয়েছে বলে জানা যায়। বাংলাদেশে প্রতি বছর সাড়ে ৩০০ থেকে পৌনে ৪০০ কোটি টাকার ভেষজ সামগ্রী আমদানি করা হয়। এগুলো সাধারণত ভেষজ ওষুধ ও প্রসাধন সামগ্রী তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ওষুধ ও ভেষজ প্রসাধনী তৈরির কারখানা অনেক বেড়েছে, আর সঙ্গতকারণে উল্লিখিত ভেষজের চাহিদাও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া শহরে এবং গ্রামে অলিতে-গলিতে বিক্রি হয় অনেক ভেষজ উদ্ভিদ। আমাদের দেশে অনায়াসে চাষাবাদযোগ্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য এবং লাভজনক ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-অর্জুন, অশোক, আতা, ডালিম/আনার, আমলকী, কুটজ/কুরচি, কয়েতবেল/কটফল, কাঁঠাল, কাগজি লেবু, কাঞ্চন, কামরাঙা, কুচিলা, খয়েরখদির, গনিয়ারী, গাব, গামার/গাম্বারী, গোড়া লেবু/জামির, চন্দন, চাপা/চম্পক, চালতা, চালমুগরা, ছাতিম, জয়ন্ড়ী, জাম, তেজপাতা, তেঁতুল, দার্বচিনি, ধাইফুল, নিম, নিশিন্দা, পলাশ, পার্বল, পেয়ারা, বহেরা, বাতাবি লেবু, বেল, মহুয়া, রক্ত চন্দন, রোহিতকা, শিমুল, সোনা, সজনে, সোনালু, হরিতকি, আগর/অগুর্ব, কর্পুর, ঘোড়ানিম, নাগেশ্বর, অনন্তমূল, আঙুর, আত্মগুপ্তা/ আলকুশী, গন্ধভাদুলে, গুড়ুচী, গুলঞ্চ, চই, পটল, পূর্ণনবা, ভৃঙ্গরাজ, শতমূলী, অশ্বগন্ধ্যা, এরন্ড, ওলোট কম্বল, কালকাসুন্দে, কালমেঘ, গোলাপ, ঘৃতকুমারী, চিতা (সাদা/লাল), সর্পগন্ধ্যা, জবা, তুলসী, বলা, বামুনহাটি, বাসক, বাবুই মেহেদী, শালপনি, তোকমা এসব।

ভেষজ উদ্ভিদ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্বঃ

ভেষজ উদ্ভিদ চাষ অন্য যেকোনো ফসল চাষের চেয়ে বহুগুণ বেশি লাভজনক এবং নিরাপদ। সমগ্র বিশ্বে ভেষজ উদ্ভিদের বিপুল চাহিদা রয়েছে। ভেষজ উদ্ভিদ রপ্তানি করে চীন প্রতি বছর আয় করে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ভারত আয় করে ৬ বিলিয়ন ডলার এবং দক্ষিণ কোরিয়ার আয় ২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। শতভাগ রপ্তানি সম্ভাবনা ছাড়াও ভেষজ উদ্ভিদের চাষ করে কৃষক তুলনামূলক অধিক লাভ করতে পারেন। অধিকাংশ ভেষজ উদ্ভিদের চাষ প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ। ভেষজ উদ্ভিদ চাষের ক্ষেত্রে সার ও কীটনাশকের ভূমিকা অত্যন্ত গৌণ, এ কারণে কৃষকের উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। গুল্মজাতীয় ভেষজ প্রায় বিনা পরিচর্যা ও বিনা খরচে উৎপাদন সম্ভব, অথচ এসব উদ্ভিদের বাজারদর বেশ চড়া।

দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বাস্থ্য রক্ষায় পারিবারিক ভেষজ বাগানঃ

আমাদের দেশে প্রচুর লতা-গুল্মজাতীয় ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে, যা গ্রামেগঞ্জে, পতিত জমিতে বিনা পরিচর্যায় জন্মায়। আমরা যদি পরিকল্পিতভাবে অতি প্রয়োজনীয় এবং সহজলভ্য ভেষজ উদ্ভিদের পারিবারিক বাগান গড়ে তুলতে পারি, তবে একদিকে যেমন আমরা ছোটোখাট রোগব্যাধিতে বিনা পয়সায় ওষুধ পাব তেমনি এসব ভেষজ পরিবারে বাড়তি অর্থের জোগান দিতে পারে। পারিবারিক পর্যায়ে ভেষজ বাগান গড়ে তুলতে বিশেষ কোনো যত্ন বা ব্যয়ের প্রয়োজন নেই, বাড়ির আনাচে-কানাচে এবং পরিত্যক্ত জমিতে অনায়াসেই এসব উদ্ভিদের চাষ করা যায়। বাড়ির নারী সদস্যরাই এসব বাগান পরিচর্যা করতে পারেন। ভেষজ উদ্ভিদ চাষে যেহেতু তেমন কোনো সার বা কীটনাশক প্রয়োজন হয় না। তাই এই বাগান সৃজনে ব্যয় খুবই কম। এভাবে কৃষক পর্যায়ে প্রতিটি বাড়িতে গড়ে ওঠা ভেষজ বাগান আমাদের ভেষজ কৃষিতে অনবদ্য অবদান রাখতে পারে। ঔষধি গাছ শুধু মানুষেরই রোগ সারায় না, এটি পরিবেশ বান্ধব এবং বাতাসে ভাসমান নানা অদৃশ্য রোগজীবাণু ধ্বংসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই ব্যাপকভাবে ঔষধি বৃক্ষ চাষের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পরিবেশ রক্ষা দুটোই সম্ভব।

ভেজষ উদ্ভিদের ঔষধী গুনাগন তুলে ধরা হলো

বাসক (Justicia adhatoda)ঃ

বাসক একটি ভারত উপমহাদেশীয় ভেষজ উদ্ভিদ। আর্দ সমতল ভূমিতে এটি বেশী জন্মে। লোকালয়ের কাছেই জন্মে বেশী। হালকা হলুদে রংয়ের ডালপালা রক্ত ১ থেকে ২ মি. উঁচু গাছ, ঋতুভেদে সর্ব্বদাই প্রায়ই সবুজ থাকে। বল্লমাকারের পাতা বেশ বড়। ফুল ঘন, ছোট স্পাইকের ওপর ফোটে। স্পাইকের বৃন্ত পাতার চেয়ে ছোট। স্পাইকের ওপর পাতার আকারে উপপত্র থাকে যার গায়ে ঘন এবং মোটা শিরা থাকে। ফুলের দল (কোরোল্লা বা পত্রমূলাবর্ত) সাদা বর্ণ। তার ওপর বেগুনী দাগ থাকে। ফল সুপারি আকৃতির।

ঔষধী গুণঃ

তাজা অথবা শুকানো পাতা ওষুধের কাজে লাগে। বাসকের পাতায় "ভাসিসিন" নামীর ক্ষারীয় পদার্থ এবং তেল থাকে। শ্বাসনালীর লালগ্রন্থিকে সক্রিয় করে বলে বাসক শ্লেষ্মানাশক হিসেবে প্রসিদ্ধ । বাসক পাতার নির্যাস, রস বা সিরাপ শ্লেষ্মা তরল করে নির্গমে সুবিধা ক'রে দেয় বলে সর্দি, কাশি এবং শ্বাসনালীর প্রদাহমূলক ব্যাধিতে বিশেষ উপকারী। তবে অধিক মাত্রায় খেলে বমি হয়, অন্তত: বমির ভাব বা নসিয়া হয়, অস্বস্তি হয়। এর মূল, পাতা, ফুল, ছাল সবই ব্যবহার হয়।

তেলাকুচা (Coccinia grandis)ঃ

তেলাকুচা এক প্রকার ভেষজ উদ্ভিদ। বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে একে 'কুচিলা', তেলা, তেলাকচু, তেলাহচি, তেলাচোরা কেলাকচু, তেলাকুচা বিম্বী ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। অনেক অঞ্চলে এটি সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। গাছটির ভেষজ ব্যবহারের জন্য এর পাতা, লতা, মূল ও ফল ব্যবহৃত হয়। এটি লতানো উদ্ভিদ। এটি গাঢ় সবুজ রঙের নরম পাতা ও কান্ড বিশিষ্ট একটি লতাজাতীয় বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। লতার কান্ড থেকে আকশীর সাহায্যে অন্য গাছকে জড়িয়ে উপরে উঠে।

ঔষধি গুণঃ

তেলাকুচা ফলে আছে 'মাস্ট সেল স্টেবিলাইজিং', 'এনাফাইলেকটিক-রোধী' এবং 'এন্টিহিস্টামিন' জাতীয় উপাদান। কবিরাজী চিকিৎসায় তেলাকুচা বেশ কিছু রোগে ব্যবহৃত হয়, যেমন- কুষ্ঠ, জ্বর, ডায়াবেটিস, শোথ (edema), হাঁপানি, ব্রংকাইটিস ও জন্ডিস।

কালমেঘ (Andrographis paniculata)ঃ

কালমেঘ একটি ভেষজ উদ্ভিদ। ১ সে.মি. লম্বা ফুলের রং গোলাপী। দেড় থেকে দু সে.মি. লম্বা ফল অনেকটা চিলগোজার মতন দেখতে। শিকড় ব্যতীত কালমেঘ গাছটির সব অংশই ঔষুধের কাজে লাগে। কালমেঘ অত্যন্ত তেতো এবং পুষ্টিকর। মানব দেহের রোগ প্রতিরোধী শক্তি বৃদ্ধি করে। জ্বর, কৃমি, আমাশয়, সাধারণ শারীরিক দুর্বলতা এবং বায়ু আধিক্যে কালমেঘ অত্যন্ত উপকারী।

ঔষধি গুনঃ

শিশুদের যকৃৎ রোগে এবং হজমের সমস্যায় কালমেঘ ফলপ্রদ। টাইফয়েড রোগে এবং জীবানুরোধে কালমেঘ কার্যকারী। গাছের পাতার রস কোষ্ঠকাঠিন্য ও লিভার রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। কালমেঘ গাছের পাতার রস জ্বর, কৃমি, অজীর্ণ, লিভার প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে পাতার রস মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা শিশুদের বদহজম ও লিভারের সমস্যায় প্রাচীনকাল থেকে এটি ব্যবহার করছে। এ গাছের রস রক্ত পরিষ্কারক, পাকস্থলী ও যকৃতের শক্তিবর্ধক ও রেচক হিসেবেও কাজ করে। আবার এ গাছের পাতা সিদ্ধ করে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে ঘা-পাঁচড়া জাতীয় রোগ দূর হয় বলে আদিবাসীদের বিশ্বাস।

অর্জুন (Terminalia arjuna)ঃ

ভেষজশাত্রে ঔষধি গাছ হিসাবে আর্জুনের ব্যবহার অগনিত। বলা হয়ে থাকে, বাড়িতে একটি অর্জুন গাছ থাকা আর এক জন ডাক্তার থাকা একই কথা। এর ঔষধি গুন মানবসমাজের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে সুপ্রাচীন কাল থেকেই।শরীরের বল ফিরিয়ে আনা এবং রণাঙ্গনে মনকে উজ্জীবিত রাখতে অর্জুন ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে মহাভারত ও বেদ-সংহিতায়।

ঔষধি গুণঃ

- ✓ অর্জুন ছাল বেটে খেলে হৃৎপিন্ডের পেশি শক্তিশালী হয়, হৃৎপিন্ডের ক্ষমতা বাড়ে।এটি রক্তের কোলেষ্টরল কমায় এবং ফলত রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনে থাকে।
- ✓ বিচুর্ণ ফল মূত্রবর্ধক হিসেবে কাজ করে এবং লিভারসিরোসিসের টনিক হিসাবে ব্যাবহৃত হয়।
- ✓ অর্জুনের ছালে ট্যানিন রয়েছে, এ টানিন মুখ, জিহ্বা ও মাড়ীর প্রদাহের চিকিৎসায় ব্যাবহার হয়।এটি মাড়ীর রক্তপাত বন্ধ করে এবং শরীরে ক্ষত, খোস পাঁচড়া দেখা দিলে অর্জুনের ছাল বেটে লাগালে সেরে যায়।
- ✓ অর্জুনের ছাল হাঁপানি, আমাশয়, ঋতুস্রাবজনিত সমস্যা, ব্যথ্যা, প্রদর ইত্যাদি চিকিৎসায়ও উপকারী।
- ✓ এটি সংকোচ ও জ্বর নিবারক হিসাবেও কাজ করে।
- ✓ এছাড়া অর্জুনে saponin রয়েছে, একটি যৌন উদ্দীপনা বাড়ায়। তাই চর্ম ও যৌন রোগে অর্জুন ব্যাবহৃত হয়।যৌন উদ্দীপনা বাড়াতেও অর্জুনের ছালের রস ব্যাবহার হয়।
- ✓ অর্জুনের ছালে essential oil রয়েছে তাই অর্জুন খাদ্যা হজম ক্ষমতা বাড়ায়।খাদ্যাতন্ত্রের ক্রিয়া স্বভাবিক রাখতে সাহায্য করে।
- ✓ ক্যান্সার কোষের বর্ধন রোধকারী gallic acid, ethy gallae I lutenolin রয়েছে অর্জুন ছালে। এ কারনে এটি ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যাহারের সুযোগ রয়েছে।

তুলসী (*Ocimum Sanctum*) ঃ

তুলসী একটি ঔষধিগাছ। তুলসী অর্থ যার তুলনা নেই। সুগন্ধিযুক্ত, কটু তিক্তরস, রুচিকর। এটি সর্দি, কাশি, কৃমি ও বায়ুনাশক এবং মুত্রকর, হজমকারক ও এন্টিসেপটিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে বিশেষ করে কফের প্রাধান্যে যে সব রোগ সৃষ্টি হয় সে ক্ষেত্রে তুলসী বেশ ফলদায়ক।

ঔষধি গুণ:

- ✓ পেট কামড়ানো, কাশি: তুলসী পাতার রসে মধু মিশিয়ে খাওয়ালে বাচ্চাদের পেট কামড়ানো, কাশি ও লিভার দোষে উপকার পাওয়া যায়।
- ✓ ঘামাচি ও চুলকানি: তুলসী পাতা ও দুর্বার ডগা বেটে গায়ে মাখলে ঘামাচি ও চুলকানি ভাল হয়। দাদ ও অন্যান্য চর্মরোগে: স্থানীয়ভাবে তুলসী পাতার রস দাদ ও অন্যান্য চর্মরোগে ব্যবহার করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। পাতার রস ফোঁটা ফোঁটা করে কানে দিলে কানের ব্যথা সেরে যায়।
- ✓ ম্যালেরিয়া: পাতা ও শিকড়ের ক্বাথ ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য বেশ উপকারী। ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসেবে প্রতিদিন সকালে গোল মরিচের সাথে তুলসী পাতার রস খেতে দেয়া হয়। যতদিন সম্ভব খাওয়া যায়।
- ✓ বসন্ত, হাম: বসন্ত, হাম প্রভৃতির পুঁজ ঠিকমত বের না হলে তুলসী পাতার রস খেলে তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসবে।
- ✓ ক্রিমি: তুলসী পাতার রসের সাথে লেবুর রস মিশিয়ে খেলে ক্রিমি রোগে বেশ উপকার পাওয়া যায়। শুষ্ক তুলসী পাতার ক্বাথ সর্দি, স্বরভঙ্গ, বক্ষপ্রদাহ, উদারাময় প্রভৃতি রোগ নিরাময় করে থাকে।
- ✓ পেট ব্যথা: অজীর্ণজনিত পেট ব্যথায় তুলসী পাতার বেশ উপকার সাধন করে থাকে। এটি হজমকারক। প্রতিদিন সকালে ১৮০ গ্রাম পরিমান তুলসী পাতার রস খেলে পুরাতন জ্বর, রক্তক্ষয়, আমাশয়, রক্ত অর্শ এবং অজীর্ণ রোগ সেরে যায়।
- ✓ বাত ব্যথা: বাত ব্যথায় আক্রান্ত স্থানে তুলসী পাতার রসে ন্যাকড়া ভিজিয়ে পট্টি দিলে ব্যথা সেরে যায়। * কীট-পতঙ্গ কামড়ালে: বোলতা, ভীমরুল, বিছা প্রভৃতি বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ কামড়ালে ঐ স্থানে তুলসী পাতার রস গরম করে লাগালে জ্বালা-যন্ত্রণা কম হয়।
- ✓ সর্দি: যারা সহজেই সর্দিতে আক্রান্ত হয় (বিশেষ করে শিশুদের) তারা কিছুদিন ৫ ফোঁটা মধুর সাথে ১০ ফোঁটা রস খেলে সর্দি প্রবণতা দূর হয়।
- ✓ তুলসী মূল শুক্র গাঢ়কারক এবং বাজীকারক।
- ✓ প্রস্রাবজনিত জ্বালা: তুলসীর বীজ পানিতে ভিজালে পিচ্ছিল হয়। এই পানিতে চিনি মিশিয়ে শরবতের মত করে খেলে প্রস্রাবজনিত জ্বালা যন্ত্রনায় বিশেষ উপকার হয়।
- ✓ কালো দাগ: মুখে বসন্তের কাল দাগে তুলসীর রস মাখলে ঐ দাগ মিলিয়ে যায়। হামের পর যে সব শিশুর শরীরে কালো দাগ হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে তুলসী পাতার রস মাখলে গায়ে স্বাভাবিক রং ফিরে আসে।

হরীতকী (*Terminalia chebula*):

হরীতকী মধ্যম থেকে বৃহদাকার চিরসবুজ বৃক্ষ। ত্রিফলার অন্যতম ফল হচ্ছে হরীতকী। হরীতকী গাছকে ভেষজ চিকিৎসকরা মায়ের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। তারা বলেন, মানুষের কাছে এ বৃক্ষ মায়ের মতোই আপন। মানুষের শরীরে সংক্রামিত প্রায় সব রোগ-ব্যাধির ওষুধ হিসেবে হরীতকীর ব্যবহার রয়েছে।

ঔষধি গুণ

অর্শরোগে, রক্তার্শে, চোখের রোগ, পিত্তবেদনা, গলার স্বর বসে যাওয়া, হৃদরোগ, বদহজম, আমাশয়, জন্ডিস, ঋতুস্রাবের ব্যথা, জ্বর, কাশি, হাঁপানি, পেটফাঁপা, ঢেঁকুর ওঠা, বর্ধিত যকৃত ও প্লীহা, বাতরোগ, মহৃত্রনালীর অসুখ, ফুসফুস, শ্বাসনালীঘটিত রোগে হরীতকী ফলের গুঁড়া ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ঘন ঘন পানির তৃষ্ণা কিংবা বমি বমিভাব কাটাতেও হরীতকী ব্যবহৃত হয়। ত্রিফলা অর্থাৎ আমলকী, বহেরা, হরীতকী_ এর প্রতিটির সমপরিমাণ গুঁড়ার শরবত কোলেস্টেরল অর্থাৎ প্রেসার বা রক্তচাপ কমানোর মহৌষধ। পাইলস, হাঁপানি, চর্ম, ক্ষত, কনজাংটিভাইটিস রোগেও হরীতকী ব্যবহৃত হয়।

আমলকী

আমলকী বা 'আমলকি' একপ্রকার ভেষজ ফল, এর ফলে মূলত ঔষধি গুণ বিদ্যমান।

ঔষধি গুণ:

* আমলকী কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে।
* বমি বন্ধে কাজ করে।
* দীর্ঘমেয়াদি কাশি সর্দি হতে উপকার পাওয়ার জন্য আমলকীর নির্যাস উপকারী।
* এটি হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কের শক্তিবর্ধক।
* আমলকী হজমে সাহায্য করে ও স্টমাক এ্যাসিডে ব্যালেন্স বজার রাখে।
* আমলকী লিভার ভাল রাখে, ব্রেনের কার্যকলাপে সাহায্য করে ফলে মেন্টাল ফাংশনিং ভাল হয়।
* আমলকী বস্নাড সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রেখে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। কোলেস্টেরল লেভেলেও কম রাখাতে যথেষ্ট সাহায্য করে।
* হার্ট সুস্থ রাখে, ফুসফুসকে শক্তিশালী করে তোলে।
* শরীর ঠান্ডা রাখে, শরীরের কার্যৰমতা বাড়িয়ে তোলে, মাসল টোন মজবুত করে।
* লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা বাড়িয়ে তুলে দাঁত ও নখ ভাল রাখে।
* জ্বর, বদহজম, সানবার্ন, সানস্ট্রোক থেকে রৰা করে।
* আমলকীর জুস দৃষ্টি শক্তি ভাল রাখার জন্য উপকারী। ছানি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। ব্রণ ও ত্বকের অন্যান্য সমস্যায় উপকারী।
* পেটের জ্বালা জ্বালাভাব কম রাখে। লিভারের কার্যকলাপে সাহায্য করে, পাইলস সমস্যা কমায়।
* শরীরের অপ্রয়োজনীয় ফ্যাট ঝরাতে সাহায্য করে। ব্রঙ্কাইটেসও এ্যাজমার জন্য আমলকীর জুস উপকারী।

ঘৃতকুমারী (*Aloe vera*)

একটি রসালো উদ্ভিদ প্রজাতি। এটি এলো পরিবারের একটি উদ্ভিদ। ঘৃতকুমারী গাছটা দেখতে অনেকটাই কাঁটাওয়ালা ফণীমনসা বা ক্যাকটাসের মতো। অ্যালোভেরা ক্যাক্টাসের মত দেখতে হলেও, ক্যাক্টাস নয়। লিলি প্রজাতির উদ্ভিদ।এর আদি নিবাস আফ্রিকার মরুভূমি অঞ্চল ও মাদাগাস্কার।

ঔষধি গুণ:

- হজমি সহায়ক: নিয়মিত ঘৃতকুমারীর রস পানে পরিপাক প্রক্রিয়া সহজ হয়। ফলে দেহের পরিপাকতন্ত্র সতেজ থাকে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। তাছাড়া ডায়েরিয়া সারাতেও ঘৃতকুমারীর রস দারুণ কাজ করে।
- শক্তিবর্ধক: আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় এমন কিছু উপাদান থাকে যা দেহে ক্লান্তি ও শ্রান্তি আনে। কিন্তু নিয়মিত ঘৃতকুমারীর রস সেবন শরীরের শক্তি যোগানসহ ওজনকে ঠিক রাখতে সাহায্য করে।
- রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: যারা দীর্ঘকাল ফিব্রোমিয়ালজিয়ার মতো সমস্যায় ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে ঘৃতকুমারীর রস দারুণ কাজ করে। এটি দেহে সাদা ব্লাড সেল গঠন করে যা ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করে।
- ক্ষতিকর পদার্থের অপসারণ: দেহ থেকে ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণে ঘৃতকুমারীর রস একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক ঔষধির কাজ করে। আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন চাপে থাকি। এছাড়া চারপাশের দূষিত পরিবেশ এবং বিভিন্ন ফাস্টফুড গ্রহণের কারণে নিয়মিত পরিপাকতন্ত্র পরিষ্কার করা দরকার। ঘৃতকুমারীর রস

সেবনের ফলে শরীরে বিভিন্ন ভিটামিনের মিশ্রণ ও খনিজ পদার্থ তৈরি হয় যা আমাদেরকে চাপমুক্ত রাখতে এবং শক্তি যোগাতে সাহায্য করে।

- প্রদাহ কমায়: ঘৃতকুমারীর রস হাড়ের সন্ধিকে সহজ করে এবং দেহে নতুন কোষ তৈরি করে। এছাড়া হাড় ও মাংশপেশির জোড়াগুলোকে শক্তিশালী করে। সেইসঙ্গে শরীরের বিভিন্ন প্রদাহ প্রশমনেও কাজ করে।
- ঘৃতকুমারী পাতার রস , শসা ও মধু: ঘৃতকুমারী পাতার রস বিষাক্ত উপাদানের প্রতি বিশেষ ভুমিকা পালন করতে পারে । এ জন্য চেহারা মেচেতার ওপর কিছু ঘৃতকুমারী পাতার রস রেখে দেয়, চেহারার ত্বকের নরম হবে এবং কিছু ক্ষতচিহ্ন দেখা যায় না । যদি আপনার মুখের মেচেতা খুব গুরুতর , তাহলে ঘৃতকুমারী পাতার রস পানির সঙ্গে মিশিয়ে খান, প্রতিদিন দু'বার ,প্রত্যেকবার ১০ মিলিলিটার ,কার্যকরভাবে মেচেতা প্রতিরোধ করা যায় । ঘৃতকুমারীর একটি পাতা, মধু এ একটি ছোট শসা ছোট করে মিশিয়ে করে মাস্ক করে এবং মেচেতার ওপর রেখে দেন, চামরার ফুস্কুড়িও প্রতিরোধ করতে পারে । উল্লেখ যে, নারীদের মুখে যদি মেচেতা থাকে, তাহলে মেক-আপ না করা ভালো । কারণ যেসব মেক-আপ ক্রিম ত্বকের সূক্ষ্মরন্ধ্রের স্বাভাবিক রূপান্তর বাধা দেবে এবং মুখের মেচেতা গুরুতর হবে ।
- শুক্রমেহেঃ- প্রধানতঃ যারা শ্লেষ্মাপ্রধান রোগে ভোগেন তাদেরই এ রোগ বেশী হয়। কোঁত দিলে অথবা প্রস্রাব করলে শুক্রস্খলন হয়, এই সব লোকের ঠান্ডা জিনিসের প্রতি আকর্ষণ বেশী দেখা যায়, শুধু এই ক্ষেত্রেই ঘৃতকুমারীর শাঁস ৫ গ্রাম একটু চিনি মিশিয়ে সকালে বা বিকালে সরবত করে খেতে হবে। অথবা শুধু চিনি মিশিয়েও খাওয়া যায়। ৬/৭ দিন খেতে হবে।
- গুল্ম রোগে:- গর্ভ হলে পেটে ব্যথা হয়না, আর গুল্মে প্রায়ই কনকনে ব্যথা হয়। তবে এটা যে গুল্ম তা নিশ্চিত হতে হবে। তাহলে ঘৃতকুমারীর শাঁস ৫/৬ গ্রাম একটু চিনি দিয়ে সরবত করে ৩/৪ দিন খেতে হবে।
- সামান্য উত্তেজনায় ধাতু/শুক্রাণু স্খলন: যাদের শুক্রাণু পাতলা তাদের জন্য দুই চামচ চটকানো ঘৃতকুমারী পাতার শাষ এবং দুই চামচ চিনি মিশিয়ে শরবত করে ১৫-২০ দিন খেলে পাতলা শুক্রাণু অকারণে স্খলন বন্ধ হবে।
- অনিয়মিত এবং অস্বাভাবিক মাজুরতা (মাসিক) হলে: ঘৃতকুমারী পাতার শাষকে ভালভাবে চটকে চালুনীতে/ঝাকীতে পাতলা আবরণ করে একবার শুকানোর পর আরেকবার তার উপরেই পাতলা আবরণ লাগাতে হবে। এভাবে কয়েকবার লাগানোর পরেই আমসত্বের মতো তৈরি হবে। মাসিকের সময় ২/৩ গ্রাম পরিমাণ পানিতে ভিজিয়ে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে খেতে হবে।
- পেটের ইন্তিজ্ঞা (মল) পরিষ্কার করতে: যখন সমস্যা হবে তখন সকালে খালি পেটে টাটকা ঘৃতকুমারী পাতার শাষ ১০/১৫ গ্রামের মতো ঠান্ডা পানিরসাথে হালকা চিনি মিশিয়ে শরবত করে খেলে পুরানো ইন্তিজ্ঞা পরিষ্কার হবে।
- অর্শরোগে: এ রোগের স্বভাবধর্ম কোষ্ঠ কাঠিন্য হওয়া। সেটা থাকুক আর নাই থাকুক, এ ক্ষেত্রে ঘৃতকুমারীর শাঁস ৫/৭ গ্রাম মাত্রায় একটু ঘি দিয়ে মিশিয়ে সকালে ও বিকালে দুই বার খেতে হবে। এর দ্বারা দাস্ত পরিষ্কার হবে এবং অর্শেরও উপকার হবে।
- চুলের জন্যে: ঘৃতকুমারী চুলের উজ্জলতা বাড়াতে কন্ডিশনারের কাজ করে। এছাড়া চুল পড়া রোধ এবং খুশকি প্রতিরোধে অসাধারণ এ অ্যালোভেরা।

নিমঃ (*Azadirachta indica*)

একটি ঔষধি গাছ যার ডাল, পাতা, রস সবই কাজে লাগে। নিম একটি বহুবর্ষজীবী ও চিরহরিৎ বৃক্ষ। আকৃতিতে ৪০-৫০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এর কান্ডের ব্যাস ২০-৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। ডালের চারদিকে ১০-১২ ইঞ্চি যৌগিক পত্র জন্মে। পাতা কাস্তের মত বাকানো থাকে এবং পাতার কিনারায় ১০-১৭ টি করে খাঁজযুক্ত অংশ থাকে। পাতা ২.৫-৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। নিম গাছে এক ধরনের ফল হয়। আঙুরের মতো দেখতে এই ফলের একটিই বীজ থাকে। জুন-জুলাইতে ফল পাকে এবং ফল তেতো স্বাদের হয়। নিম গাছের পাতা, ফল, ছাল বা বাকল, নিমের তেল,বীজ। এক কথায় নিমের সমস্ত অংশ ব্যবহার করা যায়।

ঔষধি গুণ:

বিশ্বব্যাপী নিম গাছ, গাছের পাতা, শিকড়, নিম ফল ও বাকল ওষুধের কাঁচামাল হিসেবে পরিচিত। বর্তমান বিশ্বে নিমের কদর তা কিন্তু এর অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ব্যহারের জন্য। নিম ছত্রাকনাশক হিসেবে, ব্যাকটেরিয়া রোধক হিসেবে ভাইরাসরোধক হিসেবে, কীট-পতঙ্গ বিনাশে চ্যাগাস রোধ নিয়ন্ত্রণে, ম্যালেরিয়া নিরাময়ে,দন্ত চিকিতসায় ব্যাথামুক্তি ও জ্বর কমাতে, জন্ম নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়।

থানকুনি (*Centella aciatica*)

আমাদের দেশের খুব পরিচিত একটি ভেষজ গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ। গ্রামাঞ্চলে থানকুনি পাতার ব্যবহার আদি আমল থেকেই চলে আসছে। ছোট্ট প্রায় গোলাকৃতি পাতার মধ্যে রয়েছে ওষুধি সব গুণ। থানকুনি পাতার রস রোগ নিরাময়ে অতুলনীয়।প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বহু রোগের উপশম হয় এর ভেষজ গুণ থেকে। খাদ্য উপায়ে এর সরাসরি গ্রহণ রোগ নিরাময়ে থানকুনি যথার্থ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। অঞ্চলভেদে থানকুনি পাতাকে আদামনি, তিতুরা, টেয়া, মানকি, থানকুনি, আদাগুনগুনি, ঢোলামানি, থুলকুড়ি, মানামানি, ধূলাবেগুন, নামে ডাকা হয়। তবে বর্তমানে থানকুনি বললে সবাই চেনে।

ঔষধি গুণ:

১. চুল পড়ার হার কমে:

নানা সময়ে হওয়া বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে সপ্তাহে ২-৩ বার থানকুনি পাতা খেলে স্কাল্পের ভেতরে পুষ্টির ঘাটতি দূর হয়। ফলে চুল পড়ার মাত্রা কমতে শুরু করে। চুল পড়ার হার কমাতে আরেকভাবেও থানকুনি পাতাকে কাজে লাগাতে পারেন। কীভাবে? পরিমাণ মতো থানকুনি পাতা নিয়ে তা থেঁতো করে নিতে হবে। তারপর তার সঙ্গে পরিমাণ মতো তুলসি পাতা এবং আমলা মিশিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে। সবশেষে পেস্টটা চুলে লাগিয়ে নিয়ে কিছু

সময় অপেক্ষা করতে হবে। ১০ মিনিট পরে ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে চুলটা। প্রসঙ্গত, সপ্তাহে কম করে ২ বার এইভাবে চুলের পরিচর্যা করলেই দেখবেন কেল্লা ফতে!

২.টক্সিক উপাদানেরা শরীর থেকে বেরিয়ে যায়:

নানাভাবে সারা দিন ধরে একাধিক ক্ষতিকর টক্সিন আমাদের শরীরে, রক্তে প্রবেশ করে। এইসব বিষেদের যদি সময় থাকতে থাকতে শরীর থেকে বের করে দেওয়া না যায়, তাহলে কিন্তু বেজায় বিপদ! আর এই কাজটি করে থাকে থানকুনি পাতা। কীভাবে করে? এক্ষেত্রে প্রতিদিন সকালে অল্প পরিমাণ থানকুনি পাতার রসের সঙ্গে ১ চামচ মধু মিশিয়ে খেলে রক্তে উপস্থিত ক্ষতিকর উপাদানগুলি বেরিয়ে যায়। ফলে একাধিক রোগ দূরে থাকতে বাধ্য হয়।

৩. ক্ষতের চি৩. ক্ষতের চিকিৎসা করে:

থানকুনি পাতা শরীরে উপস্থিত স্পেয়োনিনস এবং অন্যান্য উপকারি উপাদান এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই তো এবার থেকে কোথাও কেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অল্প করে থানকুনি পাতা বেঁটে লাগিয়ে দেবেন। দেখবেন নিমেষে কষ্ট কমে যাবে।

৪. হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে:

থানকুনি পাতা হজম ক্ষমতারও উন্নতি হবে। কারণ একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে থানকুনি পাতায় উপস্থিত একাধিক উপকারি উপাদান হজমে সহায়ক অ্যাসিডের ক্ষরণ যাতে ঠিক মতো হয় সেদিকে খেয়াল রাখে। ফলে বদ-হজম এবং গ্যাস-অম্বলের মতো সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে না।

৫. ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়:

থানকুনি পাতায় উপস্থিত অ্যামাইনো অ্যাসিড, বিটা ক্যারোটিন, ফয়াটি অ্যাসিড এবং ফাইটোকেমিকাল ত্বকের অন্দরে পুষ্টির ঘাটতি দূর করার পাশাপাশি বলিরেখা কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্কিনের ঔজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে কম বয়সে ত্বকের বুড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও কমে।

৬. আমাশয়ের মতো সমস্যা দূর হয়:

এক্ষেত্রে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে নিয়ম করে থানকুনি পাতা খেতে হবে। এমনটা টানা ৭ দিন যদি করতে পারেন, তাহলেই কেল্লাফতে! এই ধরনের সমস্যা কমাতে আরেকভাবেও থানকুনি পাতাকে কাজে লাগাতে পারেন। প্রথমে পরিমাণ মতো থানকুনি পাতা বেটে নিন। তারপর সেই রসের সঙ্গে অল্প করে চিনি মেশান। এই মিশ্রনটি দু চামচ করে, দিনে দুবার খেলেই দেখবেন কষ্ট কমে যাবে।

৭. পেটেররোগের চিকিৎসায় কাজে আসে:

অল্প পরিমাণ আম গাছের ছালের সঙ্গে ১ টা আনারসের পাতা, হলুদের রস এবং পরিমাণ মতো থানকুনি পাতা ভাল করে মিশিয়ে ভাল করে বেটে নিন। এই মিশ্রনটি নিয়মিত খেলে অল্প দিনেই যে কোনও ধরনের পেটের অসুখ সেরে যায়। সেই সঙ্গে ক্রিমির প্রকোপও কমে।

৮. কাশির প্রকোপ কমে:

২ চামচ থানকুনি পাতার রসের সঙ্গে অল্প করে চিনি মিশিয়ে খেলে সঙ্গে সঙ্গে কাশি কমে যায়। আর যদি এক সপ্তাহ খেতে পারেন, তাহলে তো কথাই নেই। সেক্ষেত্রে কাশির কোনও চিহ্নই থাকবে না।

৯. জ্বরের প্রকোপ কমে:

সিজন চেঞ্জের সময় যারা প্রায়শই জ্বরের ধাক্কায় কাবু হয়ে পারেন, তাদের তো থানকুনি পাতা খাওয়া মাস্ট! কারণ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে যে জ্বরের সময় ১ চামচ থানকুনি এবং ১ চামচ শিউলি পাতার রস মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেলে অল্প সময়েই জ্বর সেরা যায়। সেই সঙ্গে শারীরিক দুর্বলতাও কমে।

১০.গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দূর হয়:

অসময়ে খাওয়ার কারণে ফেঁসেছেন গ্যাস্ট্রিকের জালে? নো প্রবেলম! থানকুনি পাতা কিনে আনুন বাজার থেকে। তাহলেই দেখবেন সমস্যা একেবারে হাতের মধ্যে চলে আসবে। আসলে এক্ষেত্রে একটা ঘরোয়া চিকিৎসা দারুন কাজে আসে। কী সেই চিকিৎসা? হাফ লিটার দুধে ২৫০ গ্রাম মিশ্রি এবং অল্প পরিমাণে থানকুনি পাতার রস মিশিয়ে একটা মিশ্রনতৈরি করে ফেলুন। তারপর সেই মিশ্রন থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে প্রতিদিন সকালে খাওয়া শুরু করুন। এমনটা এক সপ্তাহ করলেই দেখবেন উপকার মিলবে।

সজনে (*Moringa oleifera*):

একটি বৃক্ষ জাতীয় গাছ। সজনের কাঁচা লম্বা ফল সবজি হিসেবে খাওয়া হয়, পাতা খাওয়া হয় শাক হিসেবে। খরা সহিষ্ণু ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের একটি উদ্ভিদ। ডাল ও বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করলেও আমাদের দেশে সাধারণত ডালের মাধ্যমে বা অঙ্গজ জননের মাধ্যমে বংশবিস্তার করানো হয়। গ্রীষ্মকাল বিশেষত এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত ডাল রোপণের উপযুক্ত সময়।

ঔষধি গুণ:

০১। প্রতি গ্রাম সজনে পাতায় একটি কমলার চেয়ে সাত গুণ বেশি ভিটামিন সি, দুধের চেয়ে চার গুণ বেশি ক্যালসিয়াম ও দুই গুণ বেশি প্রোটিন, গাজরের চেয়ে চার গুণ বেশি ভিটামিন এ এবং কলার চেয়ে তিন গুণ বেশি পটাশিয়াম বিদ্যমান। ফলে এটি অন্ধত্ব, রক্তস্বল্পতা সহ বিভিন্ন ভিটামিন ঘাটতি জনিত রোগের বিরুদ্ধে বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

০২। এতে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক থাকে এবং পালংশাকের চেয়ে তিন গুণ বেশি আয়রণ বিদ্যমান, যা এ্যানেমিয়া দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

০৩। সজনে শরীরে কোলেস্টেরল এর মাত্রা নিয়ন্ত্রনেও অন্যতম অবদান রাখে।

০৪। মানুষের শরীরের প্রায় ২০% প্রোটিন যার গাঠনিক একক হলো এমাইনো এসিড। শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মেটাবোলিজম এবং অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী পরিপূর্ণরূপে সম্পাদনে এমাইনো এসিড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানুষের শরীরের যে ৯ টি এমাইনো এসিড খাদ্যের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হয়, তার সবগুলোই এই মরিঙ্গার মধ্যে বিদ্যমান।

০৫। এটি শরীরে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে ডায়াবেটিসের মত কঠিন রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে।

০৬। নিয়মিত দৈনিক সেবন শরীরের ডিফেন্স মেকানিজমকে আরো শক্তিশালী করে এবং 'ইমিউনিটি স্টিমুল্যান্ট' হওয়ার দরুন এটি 'এইডস' আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

০৭। এটি শরীরের হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি করে পুষ্টিবর্ধক হিসেবে কাজ করে।

০৮। শরীরের ওজন কমাতেও ব্যায়ামের পাশাপাশি এটি বেশ কার্যকরী ভুমিকা পালন করে থাকে।

০৯। এটি মায়ের বুকের দুধ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই। পাতা থেকে তৈরি এক টেবিল চামচ পাউডারে ১৪% প্রোটিন, ৪০% ক্যালসিয়াম, ২৩% আয়রণ বিদ্যমান, যা ১ থেকে তিন বছরের শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে সাহায্য করে। গর্ভাবস্থায় এবং বুকের দুধ খাওয়ানোকালীন সময়ে ৬ টেবিল চামচ পাউডার একজন মায়ের প্রতিদিনের আয়রণ এবং ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করে থাকে।

১০। এটির এন্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এটি যকৃত ও কিডনী সুস্থ্য রাখতে এবং রূপের সৌন্দর্য বর্ধক হিসেবেও কাজ করে থাকে।

১১।সজনে-তে প্রায় ৯০টিরও বেশি এবং ৪৬ রকমের এন্টি-অক্সিডেন্ট বিদ্যমান।

১২। এতে ৩৬ টির মত এন্টি-ইনফ্ল্যামমেটরি বৈশিষ্ট্য আছে। এছাড়াও এটি অকাল বার্ধক্যজনিত সমস্যা দূর করে এবং ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সেশন-১৩ঃ পুষ্টি বাগানের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

উদ্দেশ্য

- পরিবারে বৈচিত্র খাবারের জন্য পুষ্টি বাগানের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা
- কিভাবে পুষ্টি বাগান স্থাপন করা যায়, কি ধরনের গাছ লাগাতে হবে, গাছ দিয়ে বেড়া, জৈব সার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা
- পুষ্টি বাগান স্থাপন করার কৌশলসমূহ নিয়ে আলোচনা

উপকরণ

- ফেস্টুন

- গল্প বলা
- একটি বাগান পরিদর্শন

সঞ্চালক পুষ্টি-বাগান/বাড়ির বাগানের উপযোগিতা বোঝাতে একটি গল্প বলবেন-

সূচিতার গল্প ঃ

সূচিতা একটি গ্রামে বড় হয়েছিল। তার বাড়িতে কখনো খাবারের অভাব ছিল না কারণ তার বাবা-মা সবজি ও ফল চাষ করতেন এবং কিছু গরু পালন করতেন। গরুর দুধের বিভিন্ন জিনিস তা থেকে বানানো হত এবং এগুলি খেতে সোমরাজি খুবই ভালবাসত ও পড়াশুনোতে খুব ভালো ছিল বলে ওকে শিক্ষকরা স্নেহ করতেন।
একটি কাছাকাছি গ্রামে ওর বিয়ে হয়। দু বছর পরেই গর্ভবতী হয়, কিন্তু ওর শ্বশুরবাড়িতে ওকে সবজি বা ফল খেতে দেওয়া হতো না, কারণ ওরা সেসব চাষ করত না এবং কেনারও সার্মথ্য ছিল না। বাচ্চার ৭ মাস বয়স হবার পর সূচিতা যখন তাকে তাজা শাক সবজি দিতে পারল না , তখনও খুবই অসন্তুষ্ট হলো।
একবার বাচ্চা অসুস্থ হওয়াতে ডাক্তারখানায় গেল। সেখানে গিয়ে জানতে পারল যে ওর বাচ্চার ওজন এবং MUAC দুটোই হলদে জোন, অথবা স্বাভাবিকের থেকে কমের মধ্যে পড়ে। ডাক্তার সূচিতাকে বললেন, যেন বাচ্চাকে পুষ্টিকর খাদ্য দেয়, এবং খাবার রান্না করা ও রাখায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে।
এর পর সূচিতা ঠিক করে যে ওর বাচ্চার খাওয়া দাওয়ার দিকে মন দেবে যাতে করে বাচ্চার ওজন আর না কমে। ঠিক করে যে যেভাবে ওর বাপের বাড়িতে দেখেছে, সেই ভাবে বাড়ির বর্জ্য পানি ব্যবহার করে ফল ও সবজির গাছ লাগাবে। কয়েক মাসের মধ্যেই সোমরাজি কিছু সবজি ফলাতে পারল, আর সেগুলিকে পরিবারের রান্নায় ব্যবহার করতে লাগলো।
সূচিতা ওর পাড়া-প্রতিবেশী অনেককেই এরকম সবজি ও ফল চাষ করতে উৎসাহ দিল। ওর স্বামী মিলে এমন একটি কর্মসূচি তৈরী করতে পারল যেখানে গ্রামের সকলে মিলে যৌথ একটি সবজি বাগান করে ব্যবসা করতে শুরু করলো। ওদের কিছু হাঁস-মুরগি এবং গরুও কেনা হলো এবং গ্রামে অর্থনীতি, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির অবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত হলো।

সঞ্চালক গল্পটি বলার পর বোঝার চেষ্টা করবেন যে গল্পটি থেকে কী শিক্ষা সদস্যরা পেলেন। সকলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পুষ্টির বাগানের উপকারিতা সম্বন্ধে বুঝতে সাহায্য করবেন।
সঞ্চালক দলের সদস্যদের জিজ্ঞেস করবেন কেউ কি তার বসতবাড়ীর বাগান সবাইকে দেখাবেন।

পুষ্টি বাগান বাস্তবায়নঃ

সঞ্চালক প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন যে তারা পুষ্টি বাগান বাস্তবায়নের জন্য কি পরিকল্পনা করছেন।
নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনাঃ

- তারা কখন ইহা বাস্তবায়ন করতে চায়?
- কি ধরনের কাজ করা প্রয়োজন? কিভাবে তারা এই কাজ করবে।
- তারা কি কোন ছোট দলে একে অপরকে সহয়তা করে কাজ করবেন কিনা?
- তারা কি এই সভার পরে পুনরায় একত্রে বসে কৌশল ঠিক করবেন-গাছ দিয়ে বেড়া তৈরিম গাছের উপকরণসমূহ সংগ্রহ, দিন এবং সময় ইত্যাদি।
- প্রত্যেক পরিবারে বসতবাড়িতে সবজি বাগানের কার্যক্রম ফলোআপ করার দায়িত্ব নিবেন?
- কিভাবে/কোথায় কোন কান কার্যক্রমের জন্য বিষেষজ্ঞ প্রয়োজন হলে কিভাবে ব্যবস্থা নিবেন?
- পুষ্টি বাগান কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময় সমস্যা হলে কি পদক্ষেপ নিবে?

- দলের সদস্যরা আলোচনা করে ঠিক করবে কি করে তারা ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত সহযোগীতা ও নির্দেশনা নিয়ে কাজটি সম্পাদন করতে পারে।

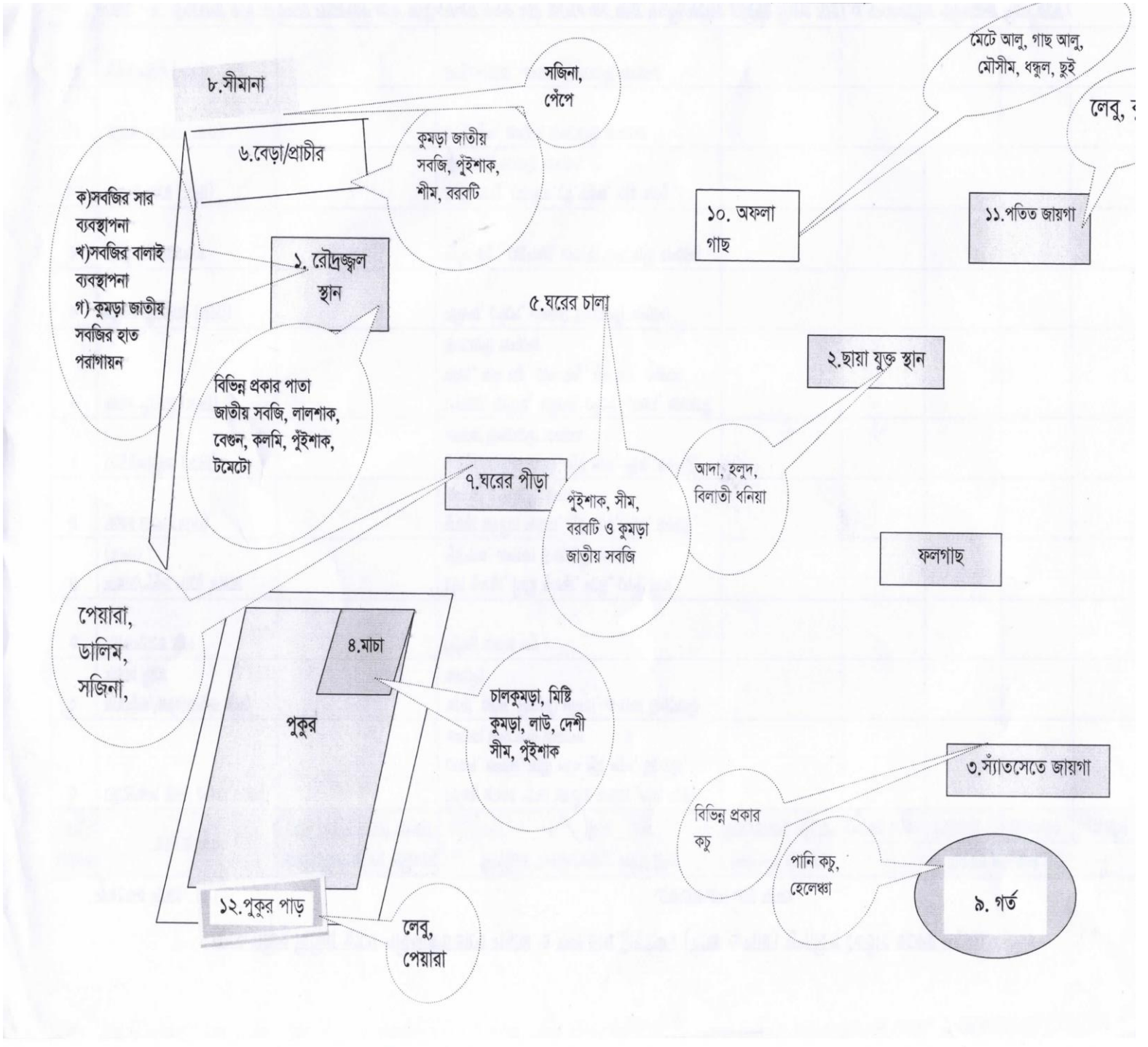
৮.সীমানা
সজিনা, পেঁপে
মেটে আলু, গাছ আলু, মৌসীম, ধন্ধুল, ছুই
লেবু,
৬.বেড়া/প্রাচীর
কুমড়া জাতীয় সবজি, পুঁইশাক, শীম, বরবটি
ক)সবজির সার ব্যবস্থাপনা
খ)সবজির বালাই ব্যবস্থাপনা
গ) কুমড়া জাতীয় সবজির হাত পরাগায়ন
১০. অফলা গাছ
১১.পতিত জায়গা
১. রৌদ্রজ্জ্বল স্থান
৫.ঘরের চালা
২.ছায়া যুক্ত স্থান
বিভিন্ন প্রকার পাতা জাতীয় সবজি, লালশাক, বেগুন, কলমি, পুঁইশাক, টমেটো
৭.ঘরের পীড়া
আদা, হলুদ, বিলাতী ধনিয়া
পুঁইশাক, সীম, বরবটি ও কুমড়া জাতীয় সবজি
ফলগাছ
পেয়ারা, ডালিম, সজিনা,
৪.মাচা
পুকুর
চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, দেশী সীম, পুঁইশাক
৩.স্যাঁতসেতে জায়গা
বিভিন্ন প্রকার কচু
পানি কচু, হেলেঞ্চা
৯. গর্ত
১২.পুকুর পাড়
লেবু, পেয়ারা

সেশন-১৪ঃ যোগাযোগের মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তন বা বিসিসি

উদ্দেশ্য

আচরণ ও ইহার ধাপসমূহ জানতে পারবে

কাউন্সিলিং ও ইহার প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবে

উপকরণ

ফেস্টুন

ফ্লিপ চার্ট

আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা স্বীকৃত যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষামূলক তথ্যাদির সাহায্যে ব্যক্তির আচরণ পরিবর্তন আনয়নে সাহায্য করে। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা অনেকেই অনেক কিছু জানি, গুরুত্ব বুঝি কিন্তু চর্চা করি না। যেমন, হাত ধোয়ার বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক। বর্তমানে খাবারের আগে হাত ধোয়ার ব্যাপক প্রচারের ফলে আমরা প্রায় সবাই হাত ধোয়া সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু অনেকেই এখনও পর্যন্ত হাত ধোয়ার অভ্যাস করেনি। তবে এই ব্যাপক প্রচার না থাকলে এর সংখ্যা আরও বেশী হতো বলে ধারণা করা যায়। এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, আমরা অনেকেই হাত ধোয়া সম্পর্কে সচেতন, আমাদের জ্ঞান আছে কিন্তু আমাদের সকলের আচরণ পরিবর্তন হয়নি। সহজ কথায় বলা যায় মানুষের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, কুসংস্কার, মতামত মূল্যবোধ ইত্যাদির কাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়নে সবচেয়ে সহজ, বোধগম্য, কার্যকর ও সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এই পদক্ষেপ বা কৌশলই (Tool) হলো আচরণ বা অভ্যাস পরিবর্তনে যোগাযোগ।

যোগাযোগঃ

আমাদের জানা তথ্য, ধারণা, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মতামত সঠিকভাবে ও অর্থসহকারে অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য ভাবে বিনিময় করতে পারার প্রক্রিয়াই হলো যোগাযোগ। এই প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র অন্যকে জানানোর বিষয়টিই অন্তর্ভুক্ত থাকে না, বরং অন্যের মতামত জানারও সুযোগ থাকে।

আচরণঃ

মানুষের প্রতিদিনের ব্যবহার বা অভ্যাসকে আচরণ বলা হয়। কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গি ও নানান কাজের মধ্য দিয়ে আচরণ বা অভ্যাস প্রকাশ পায়। সময়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভিন্নতার মাধ্যমে আচরণের প্রকারভেদ ঘটে। মানুষ তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের আচরণ বা অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা বা পরিমন্ডলের ওপরও ব্যক্তির আচরণ বা অভ্যাস নির্ভরশীল। ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন আচরণ, এটাই মানুষের ধর্ম যা সর্বজনগ্রাহ্য। তাই বড় হয়ে ওঠার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতিটি মানুষকে জেনে নিতে হয় কোথায় কোন আচরণ বা ব্যবহার গ্রহণযোগ্য। একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক মূলতঃ এই আচরণ বা অভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল।

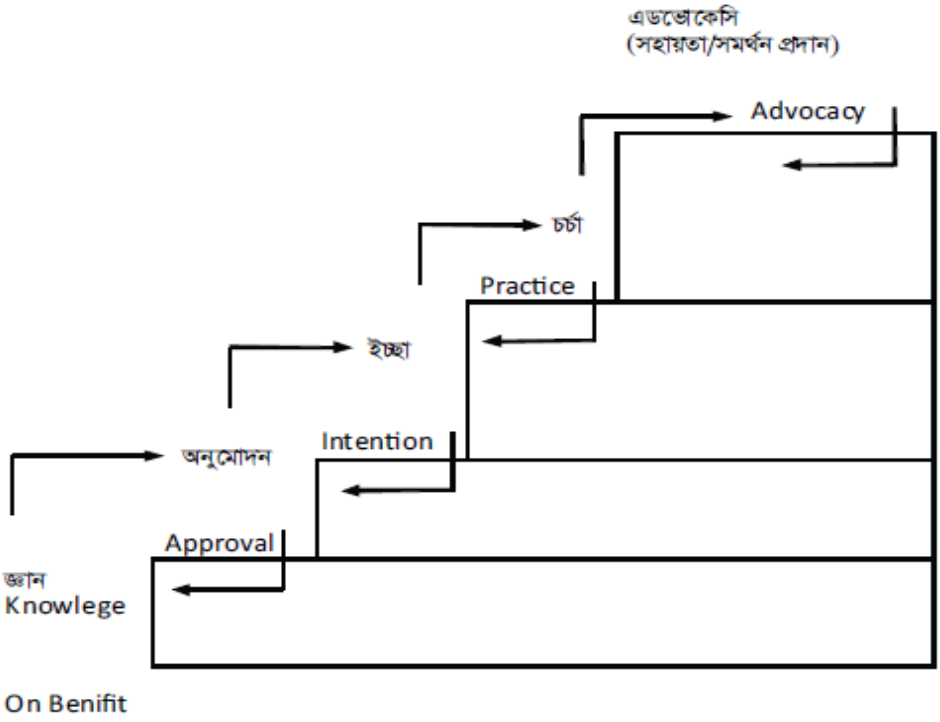

পরিবর্তনঃ

তথ্য, ধারণা, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মতামত সঠিক ও গ্রহণযোগ্যভাবে বিনিময়ের ফলে গ্রহীতার আচরণের বা অভ্যাসের যে স্থায়ী বা অস্থায়ী লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় তাকে পরিবর্তন বলা হয়। নতুন জ্ঞানের দ্বারা নিজের সুবিধা বা উপকার বোধ করলে সেই পরিবর্তনের ইচ্ছা হয় এবং তারা তা ব্যবহারে পরিণত করে।

আচরণ পরিবর্তনের ধাপঃ

কোন ব্যক্তিকে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছার জন্য ক্রম পর্যায়ের পরিবর্তনগুলোর ধারার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এই বিবর্তনের ধারাকে 'ট্রানজিশনাল রোল' বা মধ্যবর্তী সময়ের আচরণ বলে। কৌশলগত যোগাযোগ পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে যোগযোগ তত্ত্বগত যে কাঠামোটি ব্যবহৃত হয় তাঁকে, 'আচরণ পরিবর্তনের ধাপ' বলা হয়।

আচরণ পরিবর্তনের ধাপসমূহঃ

১। জ্ঞান (Knowledge)**ঃ**

- ✓ পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বা যে কোন বার্তা স্মরণ করা;
- ✓ পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অথবা যে কোন বার্তার বিষয় বুঝতে পারা; এবং
- ✓ পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি অথবা অন্য কোন সেবা সরবরাহের উৎস সম্পর্কে বলতে পারা।

২। অনুমোদন (Approval):

- ✓ পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অথবা বার্তার পক্ষে সাড়া দেয়া;
- ✓ পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অথবা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বন্ধুবান্ধব অথবা পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করা;
- ✓ বার্তার বিষয় সম্পর্কে পরিবার, বন্ধুবান্ধব অথবা কমিউনিটির অনুমোদন আছে কিনা তা চিন্তা করা; এবং
- ✓ পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অথবা বার্তার বিষয় অনুমোদন করা।

৩। ইচ্ছা (Intention**):**

- ✓ চিন্তা করা যে, স্বাস্থ্য পুষ্টি এবং পরিবার পরিকল্পনা অথবা বার্তার বিষয়টি পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে পারে;
- ✓ বিষয়টি নিয়ে সেবা প্রদানকারীর সাথে আলোচনার ইচ্ছা পোষণ করা; এবং
- ✓ পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণ করা বা সেবা গ্রহণ করার ইচ্ছা রাখা।

৪। চর্চা (Practice):

- ✓ তথ্য সরবরাহ ও সেবা গ্রহণের জন্য চাওয়া;
- ✓ পদ্ধতি বা সেবা নির্ধারণ ও ব্যবহার শুরু করা; এবং
- ✓ পদ্ধতি ব্যবহার বা সেবা প্রদান গ্রহণ চালিয়ে যাওয়া।

৫। এডভোকেসি (Advocacy) সহায়তা/সমর্থন দানঃ

- ✓ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা ও সেবাটির সুবিধা স্বীকার করা;
- ✓ অন্যান্যদেরকে ব্যবহার করতে বলা; এবং
- ✓ কমিউনিটির সেবা কর্মসূচিতে সহায়তা করা।

ব্যক্তি এবং দলের আচরণ, জ্ঞান স্তর থেকে কিভাবে এডভোকেসির স্তরে পৌছায়, আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগের ধাপের মাধ্যমে তা বুঝা যায়। মূলতঃ আচরণ পরিবর্তন একটি ধারাবাহিক নিয়ম। মানুষের আচরণ পরিবর্তন হচ্ছে যোগাযোগের মূল লক্ষ্য।

কাউন্সেলিংঃ

কাউন্সেলিং হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা (গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধদানকারী মা)/ পরিচর্যাকারীর সমস্যাগুলো কি সেগুলো মনোযোগের সাথে শোনা, তাকে সহানুভূতি দেখানো এবং তারপর যুক্তি, তথ্য ও পরামর্শের দ্বারা সমস্যাসমূহ নিরসনের উপায় খুঁজে বের করে সেবাগ্রহীতাকে বিষয়টি বিবেচনা করতে উৎসাহিত করে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করা।

কাউন্সেলিং এর গুরুত্বঃ

- ✓ আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে সাহায্য করে;
- ✓ সমস্যার সমাধান করে;
- ✓ কোন ভুল ধারণা দূর করতে সাহায্য করে; এবং
- ✓ অভ্যাস/ আচরণ পরিবর্তনে বা নতুন কোন অভ্যাস/ আচরণ গ্রহণে সহায়তা করে।

সফলভাবে কাউন্সেলিং করার জন্য নিচের ধাপগুলো মেনে চলতে হবেঃ

- ✓ আলোচনার পরিবেশ তৈরী করা
- ✓ সেবাগ্রহীতার কথা শোনা
- ✓ আলোচনার মধ্য থেকে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা
- ✓ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করা
- ✓ সেবাগ্রহীতা কি বুঝেছেন তা যাচাই করে দেখা
- ✓ আত্মবিশ্বাস/আস্থা তৈরী করা

কাউন্সেলিং এর দক্ষতাসমূহ: যোগাযোগের ধরণ এবং এ সময় যা লক্ষ্য রাখতে হবে যোগাযোগের ধরণ ২ প্রকারঃ

১. কথা না বলে যোগাযোগ করা (Non- verbal communication)
২. কথা বলে যোগাযোগ করা (Verbal communication)

কথা না বলে যোগাযোগের সময় স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে।

- ○ একই অবস্থানে বসা (Keep your head level)
- ○ চোখে চোখ রাখা (Eye contact)
- ○ কোন বাধা না রাখা (Remove barrier)
- ○ সময় নেয়া (Taking time)
- ○ সঠিকভাবে স্পর্শ করা (Appropriate Touch)

২. কথা বলে যোগাযোগ করা (Verbal communication):

স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে যোগাযোগের সময় তাদেরকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে।

- ○ খোলা প্রশ্ন করা (Open Question)

- মায়ের কথায় আগ্রহ প্রকাশ করা (Use response & show interest)
- মায়ের কথার পুনরাবৃত্তি করা (Reflect back)
- মায়ের অনুভূতি বুঝতে পারা (Show that you understand how she feels)
- বিচারমূলক শব্দ পরিহার করা (Avoid using judging words)

খোলা প্রশ্ন করাঅংশ (open ouestions)ঃ

খোলা প্রশ্ন সাধারণত খুবই উপকারী। প্রশ্নের উত্তরে মা অবশ্যই আপনাকে কিছু তথ্য দিবে। খোলা প্রশ্ন সাধারণত শুরু হয় 'কিভাবে, কি, কখন, কোথায়, কেন' এই সব শব্দ দিয়ে। যেমন "কিভাবে আপনি শিশুকে খাওয়াচ্ছেন?" বদ্ধ প্রশ্ন একটু কম উপকারী। মায়ের কাছ থেকে যা আশা করা হয় মা তাই উত্তর দেয় এবং উত্তরটি হ্যাঁ বা না হয়। বদ্ধ প্রশ্ন সাধারণত শুরু হয়: "আপনি কি খেয়েছেন?" "আপনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান?"

সহানুভূতি দেখানো(Using responses and gestures which show interest)ঃ

একজন মায়ের সাথে কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে বোঝাতে হবে যে আপনি তার কথা মনোযোগ সহকারে শুনছেন এবং কথা শোনার আগ্রহও আপনার আছে। আপনি যে তার কথা আগ্রহ নিয়ে শুনছেন এটা বোঝানোর জন্য মাঝে মাঝে তার দিকে তাকান, মাথা নাড়ান এবং হাসি দিন।

উদাহরণ-

মা: আমি উদ্বিগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে আমি নিশ্চয় এমন কিছু খেয়েছিলাম যার জন্য সে আমার বুকের দুধ হজম করতে পারেনি।

স্বাস্থ্যকর্মী: আহা (সহানুভূতি প্রকাশের জন্য মাথা নাড়ুন)

মায়ের কথার পূনরাবৃত্তি করা (Reflect back what the mother says):

মাকে আশ্বস্থ করতে হবে যে আপনি মায়ের কথা শুনছেন, এ জন্য মা যা বলছে সেই কথা আরো পরিস্কার করে বোঝার জন্য মাকে একই কথা বলতে হবে, এতে করে মা বুঝবেন আপনি তার কথা শুনছেন।

উদাহরণ-

মা: আমার শিশু বেশি খেতে চায়। সারাক্ষণই প্রায় দুধ মুখে নিয়ে রাখতে চায়, আমি ক্লান্ত বোধ করি

স্বাস্থ্যকর্মী: শিশুটি খুব বেশি খেতে চায়।

মায়ের অনুভূতি বুঝা (Show that you understand how she feels):

যখন একজন মা তার সন্তানের ব্যাপারে কোন প্রকার অনুভূতি ব্যক্ত করবে তখন আপনাকে অবশ্যই তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং তাকে বোঝাতে হবে যে আপনি তার অনুভূতি বুঝতে পেরেছেন। সহমর্মিতা ও সহানুভূতি দুইটি ভিন্ন বিষয়। যখন আপনি কারো জন্য দুঃখ পেলেন তার মানে আপনি তাকে সহানুভূতি দেখাচ্ছেন, কিন্তু বিষয়টিকে আপনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে অনুভব করতে হবে। একজন মায়ের অনুভূতি বোঝার জন্য সহমর্মিতা অনেক বেশি কার্যকরী। সহমর্মিতা দিয়ে একই সাথে মায়ের ভাল ও খারাপ দুইটি অনুভূতিকেই সহজে অনুধাবণ করা যায়।

মা: শিশু আমার বুকের দুধ খেতে চাচ্ছে না। আমার বুকের দুধ সে এখন পছন্দ করছে না।

স্বাস্থ্যকর্মী: আপনি কি মনে করছেন যে সে আপনাকে পছন্দ করছে না?

মা: হ্যাঁ, আমার মনে হয় সে আমাকে ভালবাসে না, সে এই সপ্তাহ থেকে এই রকম শুরু করেছে যখন থেকে তার দাদী আমাদের সাথে থাকতে এসেছে এবং তাকে বোতলে করে দুধ খাওয়াচ্ছে।

স্বাস্থ্যকর্মী: আপনার কি মনে হচ্ছে তিনিই শুধু শিশুকে খাওয়াতে চাচ্ছেন?

মা: হ্যাঁ, সে আমার শিশুকে আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিতে চায়।

মন্তব্য: স্বাস্থ্যকর্মী সরাসরি কোন প্রশ্ন করা ব্যতিরেকে সহমর্মিতা দিয়ে মায়ের অনুভূতি এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেন।

স্বস্তিদায়ক অনুভূতি:

মা: শিশু খুব ভাল ভাবে দুধ টেনে খাচ্ছে আর খাওয়ার পর সে খুশিতে থাকে।
স্বাস্থ্যকর্মী: আপনি নিশ্চয় খুব খুশি যে আপনার শিশু ভাল আছে।
মা: হ্যাঁ, আমি খুবই খুশি এবং আমি তাকে বোতলের দুধ খাওয়াবো না।
স্বাস্থ্যকর্মী: আপনি আপনার শিশুকে আনন্দের সাথে দুধ খাওয়াচ্ছেন এটা খুবই ভাল।

মন্তব্য: এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মায়ের সুখানুভূতিতে ও আপনাকে আগ্রহ প্রকাশ করতে হবে।

বিচারমূলক শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা(Avoid using judging words):

কাউন্সেলিং-এর সময় বিচারমূলক শব্দ পরিহার করলে আসল তথ্য পাওয়া যায়। এ জন্য বিচারমূলক শব্দ পরিহার করা উচিত। বাংলা ভাষায় কিছু কিছু শব্দ বলা যেতে পারে যেমন - ভাল, মন্দ, ঠিক, ভুল, খারাপ, যথেষ্ট, যথাযথভাবে ইত্যাদি এগুলো বিচারমূলক শব্দ।

উদাহরণ-

আপনার শিশু কি ঠিকমত দুধ খায়? এখানে'ঠিকমত' বিচারমূলক শব্দ। এর উত্তরে মা হ্যাঁ বা না বলবেন। আর যদি প্রশ্ন করা যায় আপনার শিশুকে দুধ খাওয়ানো কেমন চলছে? এর উত্তরে মা অনেক কথা বলবেন। তখন কাউন্সেলরের বুঝতে সুবিধা হবে যে সমস্যাটা কোথায়। এজন্য কাউন্সেলিং এ বিচারমূলক শব্দ পরিহার করা উচিত।

মায়ের আত্মবিশ্বাস অর্জনের ধাপসমূহ:

GALIDRAA

- ✓ **G-Greet** (গ্রীট) হাসি মুখে মাকে স্বাগত জানান
- ✓ **A- Ask and Assess** (আস্ক এন্ড অ্যাসেস) - বর্তমান অভ্যাসসমূহ নিয়ে আলোচনা করুন
- ✓ **L-Listen** (লিসেন) - কি বলে, তা শুনুন
- ✓ **I-Identify** (আইডেনটিফাই) - সম্ভাব্য সমস্যাটি সনাক্ত করুন
- ✓ **D-Discuss** (ডিসকাস) - কিভাবে এই সব সমস্যা দূর করা যায় সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন
- ✓ **RA-Recommend and Negotiate Actions** (রিকমেন্ড এন্ড নেগোশিয়েট একশনস)-

বিকল্পগুলো তুলে ধরুন, অবস্থার উন্নয়নে তারা নতুন নতুন চর্চাগুলো অনুশীলন করতে রাজি আছেন কিনা তা জানতে চান এবং সেবাগ্রহণকারীকে বলুন কোন একটি ব্যবস্থা বাছাই করতে যা তারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন

- ✓ **A-Appoinment** (এ্যাপয়েন্টমেন্ট) - ফলো-আপ ভিজিটের জন্য তারিখ ঠিক করুন।

কিভাবে মায়ের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে:

- ✓ মায়ের কথা গ্রহণ করা- মা যা বলছেন তা মনোযোগ দিয়ে শোনা। মায়ের কথা বিশ্বাস করা এবং তিনি যা বলেছেন সে ব্যাপারে তার সাথে তর্ক বা উল্টা প্রশ্ন না করা বা মাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে না দেয়া

- ✓ মায়ের কাজের প্রশংসা করা এবং শিশুর সম্পর্কে ভালো কথা বলা
- ✓ হাতে কলমে সাহায্য করা- প্রয়োজনে মাকে শিশুর খাবার তৈরী করতে বা মা যাতে আরাম করে সময় নিয়ে শিশুকে খাওয়াতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা
- ✓ প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়া (২/৩ টির বেশী না) - দুই তিনটার বেশী পরামর্শ একদিনে না দেয়া। খুব বেশী বললে মার পক্ষে কোনটাই করা সম্ভব হবে না। মার পক্ষে করা সম্ভব এমন ২-৩ টি পরামর্শ দিতে হবে এবং তার কাছে শুনে নিতে হবে আপনি যা বললেন তা কি কি এবং তার পক্ষে এসব করা সম্ভব কি না
- ✓ সহজ ভাষা ব্যবহার করা- সহজ ভাষায় অর্থাৎ যে ভাবে আমরা কথা বলি সেভাবে মায়ের সাথে কথা বলতে হবে। কঠিন ভাষা যা মায়ের বুঝতে অসুবিধা হয় তা ব্যবহার করা যাবে না